৩

কোষ রসায়ন

Cell Chemistry

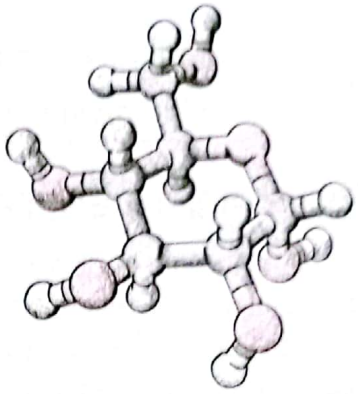

প্রধান প্রধান শব্দ

- শর্করা
- বিজারক শর্করা
- গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী
- স্টার্চ
- সেলুলোজ
- প্রোটিন
- পেপটাইড বন্ধনী
- লিপিড
- এনজাইম
- ক্যাটালেজ

বহুকোষী জীবন্ত সত্ত্বাগুলো সুসংগঠিত। কারণ তাদের দেহ অঙ্গ, টিস্যু, কোষ, অঙ্গাণু প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এককোষীসহ সকল প্রকার কোষে সবসময় বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান। এ প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে জীবদেহে সবসময় পুনর্গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ চলতে থাকে। সকল প্রকার প্রক্রিয়াগুলোকে একত্রে বিপাক (metabolism) বলে। আমরা কোষে প্রাপ্ত নানা প্রকার জৈব রাসায়নিক বস্তুগুলোকে কয়েকটা প্রধান গ্রুপে ভাগ করতে পারি। যেমন— কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, ভিটামিন, হরমোন, এনজাইম, বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি। কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ও প্রোটিনে শক্তি সঞ্চিত থাকে, যা জীব বিপাক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে। এজন্য এদেরকে জীবদেহের জৈব জ্বালানি বলা হয়। প্রাণরাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় জীবদেহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এসকল রাসায়নিক উপাদান জীব পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে। জীবদেহের সকল জৈবিক ক্রিয়াকলাপে এ রাসায়নিক উপাদানগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। জীববিজ্ঞানীরা দেখেছেন কোষের উপাদানসমূহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে জীবনের গোপন রহস্য। কোষের উপাদান তথা কোষের জৈব রসায়ন খুবই জটিল এবং এসব রাসায়নিক উপাদানগুলো কোষ নির্ভর। জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে তাই প্রত্যেকেরই কোষস্থ জৈব রসায়ন সম্পর্কে জানা আবশ্যক। এ অধ্যায়ে জীবের রাসায়নিক উপাদান হিসেবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড ও এনজাইম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- জীবের রাসায়নিক উপাদান
- কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস
- জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা
- উৎসেচক বা এনজাইম এর ক্রিয়ার প্রকৃতি
- উৎসেচক বা এনজাইম এর শ্রেণিবিন্যাস
- বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে উৎসেচকের ব্যবহার

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	জীবের রাসায়নিক উপাদান ও কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা
পাঠ ২	মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা
পাঠ ৩	ডাইস্যাকারাইড
পাঠ ৪	পলিস্যাকারাইড
পাঠ ৫	অ্যামিনো অ্যাসিড ও প্রোটিন বা আমিষ
পাঠ ৬	লিপিড বা স্নেহ পদার্থ
পাঠ ৭	এনজাইম বা উৎসেচক
পাঠ ৮	এনজাইমের কাজের কৌশল

CamScanner

পাঠ ১

জীবের রাসায়নিক উপাদান ও কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা
Chemical Components of Lives and Carbohydrate

৩.১ জীবের রাসায়নিক উপাদান (Chemical Components of Lives)

জীবের রাসায়নিক উপাদান বলতে মূলত জীবকোষের রাসায়নিক উপাদানকে বোঝায়। কারণ, কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। একক অথবা অসংখ্য কোষের সমন্বয়েই জীবদেহ গঠিত। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান নিয়ে কোষ তথা জীবদেহ গঠিত। এ সকল রাসায়নিক উপাদানের গঠন, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের উপর জীবদেহের গঠন ও জৈবিক কার্যক্রম নির্ভরশীল। রাসায়নিক উপাদানগুলোর অধিকাংশই জীবদেহের অভ্যন্তরে তথা কোষের ভেতর তৈরি হয়। জীবকোষের এসকল রাসায়নিক উপাদানকে বলা হয় **জৈব অণু** (biomolecules)। জৈব অণুগুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে খুবই ছোট এবং অতি সাধারণ, যাদের বলা হয় **মাইক্রোমলিকিউল** (micromolecules)। আবার, কিছু জৈব অণু রয়েছে যারা বৃহদাকৃতির এবং জটিল গঠন বিশিষ্ট। বৃহৎ ও জটিল গঠন বিশিষ্ট এসকল জৈব অণুকে বলা হয় **ম্যাক্রোমলিকিউল** (macromolecules)। মাইক্রো ও ম্যাক্রোমলিকিউলগুলোর সমন্বয়ে কোষ তথা জীবদেহ গঠিত হয় এবং এগুলো জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশে ভূমিকা রাখে।

জীবদেহের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানের গঠন, সংশ্লেষণ, ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং তাদের গবেষণা নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে প্রাণরসায়ন (biochemistry) বলে। একটি জীবকোষকে বিশ্লেষণ করলে প্রধান যে উপাদানটি পাওয়া যায় তা হলো পানি। জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমের প্রায় ৬০%–৯০% পানি। কোষ তথা জীবদেহের অবশিষ্ট উপাদান হলো মূলত কঠিন বস্তু (solid matters)। এই কঠিন বস্তুর মধ্যে রয়েছে জৈব ও অজৈব পদার্থ এবং এদের বিশ্লেষণ করলে প্রধানত ১৭টি মৌল পাওয়া যায়। এই ১৭টি মৌল হলো– C, H, O, N, P, Ca, Mg, K, Fe, Na, Cl, Mn, B, S, Zn, Mo এবং Cu। এ সকল মৌল সম্মিলিতভাবে বড় আকারের জৈব যৌগ গঠন করে। এদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, বিভিন্ন এনজাইম, অন্যান্য জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি প্রধান। অজৈব পদার্থের মধ্যে অন্যতম হলো পানি। অন্যান্য অজৈব পদার্থকে অজৈব লবণ বা খনিজ লবণ হিসেবে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

কোষীয় উপাদানের ৯৫%-ই হলো অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন এবং নাইট্রোজেন। কোষে যেসকল রাসায়নিক মৌলিক উপাদান এবং রাসায়নিক গঠন উপাদান রয়েছে নিচে ভিন্ন দুটি ছকে তা উপস্থাপন করা হলো–

কোষের রাসায়নিক মৌলিক উপাদান	
উপাদান	শতকরা হার (%)
নাইট্রোজেন	৩
অক্সিজেন	৬২
হাইড্রোজেন	১০
কার্বন	২০
ক্যালসিয়াম	২.৫
ফসফরাস	১.১৪
সালফার	০.১৪
ক্লোরিন	০.১৬
পটাসিয়াম	০.১১
সোডিয়াম	০.১০
ম্যাগনেসিয়াম	০.০৭
আয়োডিন	০.০১৩
আয়রন	০.০১০
নগণ্য (ট্রেস) উপাদান (কপার, সিলিকন ইত্যাদি)	০.৭৫৬
মোট	১০০

কোষের রাসায়নিক গঠন উপাদান		
উপাদান		শতকরা হার (%)
জৈব	কার্বোহাইড্রেট	১-৫
	প্রোটিন	৭-১০
	লিপিড	১-২
	অন্যান্য জৈব পদার্থ	১-১.৫
অজৈব	পানি	৬০-৯০
	অন্যান্য	১-৫

CamScanner

৩.২ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা (Carbohydrate)

কার্বোহাইড্রেট হলো জীবদেহের গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক ও সঞ্চয়ী উপাদান। আমাদের খাদ্য তালিকারও প্রধান উপাদান কার্বোহাইড্রেট। যে সকল জৈব যৌগ শুধু কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত এবং যেখানে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত সাধারণত ১ : ২ : ১, সে সকল যৌগকে **কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা** বলে। যেমন- গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$)। তবে অনেক যৌগ আছে যেখানে এমন অনুপাত না থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট। যেমন- ডিঅক্সিরাইবোজ ($C_5H_{10}O_4$)। আবার এমন অনুপাত থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট নয়, যেমন-ফরমালডিহাইড (HCHO), অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) প্রভৃতি। কারণ এদের ধর্ম কার্বোহাইড্রেটের মতো নয়। **Hydrates of carbon** থেকে carbohydrates শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে, যেখানে ১ : ২ : ১ অনুপাত প্রযোজ্য। এর অর্থ হলো 'কার্বনের জলায়ন' অর্থাৎ এক অণু পানির সাথে এক অণু কার্বন (CH_2O) এই অনুপাতে গঠিত বিভিন্ন প্রকার যৌগ। শুধুমাত্র মনোস্যাকারাইড এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই ফর্মুলাটি প্রযোজ্য। আধুনিক ধারণা অনুসারে, নাইট্রোজেন বা সালফার সমৃদ্ধ অল্প কিছু যৌগকেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, **যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটোন জাতীয় যৌগে অনেকগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে অনেকগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে সেসব যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলে।** অধিকাংশ উদ্ভিদদেহের শুষ্ক ওজনের ৫০-৮০% কার্বোহাইড্রেট থাকে। পৃথিবীর বুকে সকল জৈব বস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যা জীবদেহে গাঠনিক উপাদান বা সঞ্চয়ী উপাদান হিসেবে থাকে।

৩.২.১ কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Carbohydrate)

১. কার্বোহাইড্রেট সাধারণত তন্তুময়, দানাদার বা পাউডার জাতীয় পদার্থ।
২. এরা মিষ্টি স্বাদযুক্ত অথবা স্বাদহীন হয়।
৩. এদেরকে অ্যাসিডের সাথে মিশালে এস্টার গঠন করে।
৪. ক্রমান্বয়ে তাপ প্রয়োগ করলে অঙ্গারে পরিণত হয়।
৫. অধিকাংশ কার্বোহাইড্রেটই পানিতে দ্রবণীয়।
৬. এরা আলোক সমাণুতা ও সক্রিয়তা প্রদর্শন করে।

৩.২.২ জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা বা কাজ (Role of Carbohydrate in Living Organisms)

১. কার্বোহাইড্রেট জারিত হয়ে জীবদেহে শক্তি যোগায়। অর্থাৎ এটি জীবদেহে শক্তির মূল উৎস।
২. উদ্ভিদদেহ গঠনকারী মূল রাসায়নিক পদার্থ (৫০-৮০%) হিসেবে কাজ করে। যেমন— কোষ প্রাচীরের উপাদান সেলুলোজ, কাইটিন, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন প্রভৃতি।
৩. উদ্ভিদে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে স্টার্চ, ইনুলিন এবং প্রাণী ও ছত্রাকে গ্লাইকোজেনরূপে থাকে যা প্রয়োজনে পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয়।
৪. অন্যান্য যৌগের মধ্যবর্তী পদার্থ বা গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৫. ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাকে সাহায্য করে।
৬. নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ হলো পেন্টোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট।
৭. বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইমের গাঠনিক অংশ হিসেবে থাকে। যেমন- ATP, NADP, FAD প্রভৃতি।
৮. হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে।
৯. ক্রেবস্ চক্র, ক্যালভিন চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ চক্রে কার্বোহাইড্রেট অংশ নেয়।
১০. উদ্ভিদের দৃঢ়তা প্রদানে সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট বিশেষ ভূমিকা রাখে।
১১. জীবের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকাংশই আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে।
১২. উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর মূল গাঠনিক উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট।

CamScanner

৩.২.৩ কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Carbohydrate)

ক. কার্বোহাইড্রেটকে স্বাদের উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— (১) **শ্যুগার:** এরা মিষ্টি স্বাদযুক্ত, পানিতে দ্রবণীয় ও দানাদার; যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি; (২) **নন-শ্যুগার:** এদের স্বাদ মিষ্টি নয় এবং এরা অদানাদার ও পানিতে অদ্রবণীয়। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

খ. রাসায়নিক গঠন অণুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট চার প্রকার। যথা— মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড।

১. **মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা (Monosaccharide,** গ্রিক *mono* = এক + *saccharin* = চিনি**):** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না তাদেরকে **মনোস্যাকারাইড** বলে। সাধারণভাবে এরা সরল শর্করা নামে পরিচিত। এদের অণুতে কার্বনের সংখ্যা ৩ থেকে ১০টি। এর সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n}O_n$। সরল শর্করা মিষ্টি স্বাদযুক্ত, পানিতে দ্রবণীয়, স্ফটিকাকার ও রিডিউসিং প্রকৃতির। এসব যৌগে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) অথবা কিটোন (=CO) গ্রুপ এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে। সরল শর্করা জটিল কার্বোহাইড্রেটের গাঠনিক একক হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতিতে যে মনোস্যাকারাইড সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হলো D-গ্লুকোজ। অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপ মনোস্যাকারাইডগুলোতে মুক্তভাবে থাকে বলে এদেরকে **রিডিউসিং শ্যুগার** বলা হয়। বেনেডিক্ট দ্রবণের $Cu(OH)_2$ (কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড) উক্ত শ্যুগারের –CHO বা, C=O গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে কিউপ্রাস অক্সাইড-এ (Cu_2O) পরিণত হয়, যা লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়। তাই রিডিউসিং শ্যুগার পরীক্ষা করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মনোস্যাকারাইড সাধারণত মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট। কার্বনের সংখ্যা অনুসারে মনোস্যাকারাইড বিভিন্ন প্রকার।

i. ট্রায়োজ (Triose): ৩-কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ট্রায়োজ বলে। এরা দ্রবণীয় মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদে এরা ফসফেট এস্টাররূপে থাকে। যেমন— গ্লিসারালডিহাইড, ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন।

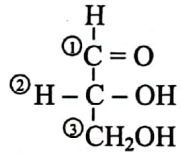

চিত্র-৩.১: গ্লিসারালডিহাইড

ii. টেট্রোজ (Tetrose): ৪-কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে টেট্রোজ বলে। যেমন- ইরিথ্রোজ, যা উদ্ভিদদেহে ইরিথ্রোজ ৪–ফসফেট হিসেবে থাকে। এটি ক্যালভিন চক্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

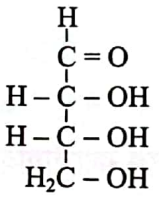

চিত্র-৩.২: ইরিথ্রোজ

iii. পেন্টোজ (Pentose): ৫-কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে পেন্টোজ বলে। যেমন- রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ, রাইবুলোজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পেন্টোজ মনোস্যাকারাইড।

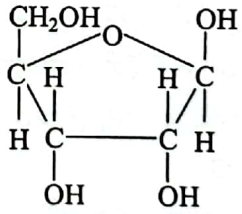

চিত্র-৩.৩: রাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

iv. হেক্সোজ (Hexose): ৬-কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেক্সোজ বলে। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যাল্যাকটোজ ইত্যাদি। এরা উদ্ভিদকোষে মুক্ত অবস্থায় (যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ) অথবা অন্য জটিল কার্বোহাইড্রেটের ইউনিট (যেমন– স্টার্চ) হিসেবে অবস্থান করে।

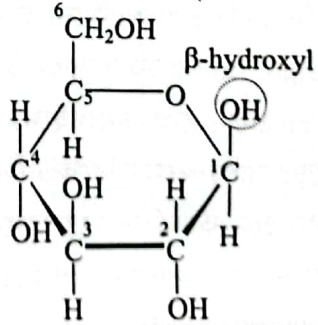

চিত্র-৩.৪: β-D-গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার)

v. হেপ্টোজ (Heptose): ৭-কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেপ্টোজ বলে। যেমন- সেডোহেপ্টুলোজ।

CamScanner

২. **ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide):** দুটি মনোস্যাকারাইড যুক্ত হয়ে যে শর্করা গঠন করে তাকে **ডাইস্যাকারাইড** বলে। এর সাধারণ সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। যেমন- সুক্রোজ, মল্টোজ, সেলোবায়োজ প্রভৃতি। এক অণু সুক্রোজ আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। দুই অণু মনোস্যাকারাইডের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়ার ফলে দুটো $-OH$ মূলক থেকে এক অণু পানি অপসারিত হলে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডাইস্যাকারাইড অণুতে উভয় মনোস্যাকারাইডের C-O-C নতুন বন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্ট বন্ধনকে (–O–) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বলে।

৩. **অলিগোস্যাকারাইড (Olygosaccharide,** গ্রিক *oligo* = few বা স্বল্প + *saccharin* = sugar বা চিনি**):** যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাদের অলিগোস্যাকারাইড বলে। মনোস্যাকারাইডের সংখ্যার ভিত্তিতে অলিগোস্যাকারাইডকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। যেমন- ট্রাইস্যাকারাইড, টেট্রাস্যাকারাইড প্রভৃতি। অলিগোস্যাকারাইডে মনোস্যাকারাইডগুলো পরস্পর **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী** (glycosidic bond) দিয়ে সংযুক্ত থাকে।

৪. **পলিস্যাকারাইড (Polysaccharide,** গ্রিক *Poly* = many বা অনেক + *saccharin* = sugar বা চিনি**):** দশের অধিক সংখ্যক মনোস্যাকারাইড পলিমারযুক্ত হয়ে যে শর্করা গঠন করে তাদের পলিস্যাকারাইড বলে। সাধারণত কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার মনোস্যাকারাইড **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী** দিয়ে সংযুক্ত হয়ে বৃহৎ পলিস্যাকারাইড শিকল (শাখাযুক্ত বা শাখাহীন) গঠন করে। যেমন– স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, ইনুলিন, কাইটিন ইত্যাদি। এদের আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। প্রকৃতিতে সেলুলোজের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং স্টার্চের পরিমাণ দ্বিতীয়। গঠনগতভাবে পলিস্যাকারাইড দু'প্রকার। যথা–

i. **হোমোপলিস্যাকারাইড (Homopolysaccharide):** এরা একই প্রকার মনোস্যাকারাইড অণু দিয়ে গঠিত। যেমন- সেলুলোজ, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ইনুলিন ইত্যাদি। এরা শুধু গ্লুকোজের অণু দিয়ে তৈরি।

ii. **হেটেরোপলিস্যাকারাইড (Heteropolysaccharide):** এরা দুই বা ততোধিক ধরনের মনোস্যাকারাইড অণু দিয়ে তৈরি। যেমন- হেমিসেলুলোজ, পেকটিন ইত্যাদি।

কাজের ভিত্তিতে পলিস্যাকারাইড তিন ধরনের হতে পারে। যথা— (i) **সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড;** (ii) **গাঠনিক পলিস্যাকারাইড** ও (iii) **মিউকো বস্তুসমূহ**।

i. **সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড (Storage Polysaccharide):** যে সকল কার্বোহাইড্রেট জীবদেহে সঞ্চিত থাকে এবং শক্তির উৎস বা অন্যসব জৈব অণু সংশ্লেষণের মধ্যবর্তী পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ইনুলিন, প্যারামাইলাম ইত্যাদি।

ii. **গাঠনিক পলিস্যাকারাইড (Structural Polysaccharide):** কোষদেহের কাঠামো সৃষ্টিকারী পলিস্যাকারাইডকে গাঠনিক পলিস্যাকারাইড বলে। এরা মূলত কোষ প্রাচীর গঠনে ভূমিকা রাখে। যেমন- সেলুলোজ, কাইটিন ইত্যাদি।

iii. **মিউকো বস্তুসমূহ (Muco Substance):** পিচ্ছিল বস্তু উৎপাদনকারী পলিস্যাকারাইড মিউকো বস্তু নামে পরিচিত। যেমন- মিউসিলেজ, পেকটিন, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি।

গ. **বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট দু'প্রকার**। যথা-

১. **বিজারক শর্করা (Reducing Sugar):** যেসব কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে ১টি মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (= CO) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে **বিজারক শর্করা বা রিডিউসিং শ্যুগার** বলে। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি। এরা বেনেডিক্টস বিকারক এবং ফেহলিং বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে।

CamScanner

২. **অবিজারক শর্করা (Non-Reducing Sugar):** যেসব কার্বোহাইড্রেটে মুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না তাদেরকে **অবিজারক শর্করা বা নন-রিডিউসিং শ্যুগার** বলে। যেমন- সুক্রোজ, স্টার্চ, সেলুলোজ ইত্যাদি। সুক্রোজে α–D গ্লুকোজের ১নং কার্বনের OH এবং β–D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে একটি "O ব্রিজ" তৈরি হয়। ফলে এদের মুক্ত CHO বা C=O গ্রুপ থাকে না। এদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। তারপর অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে।

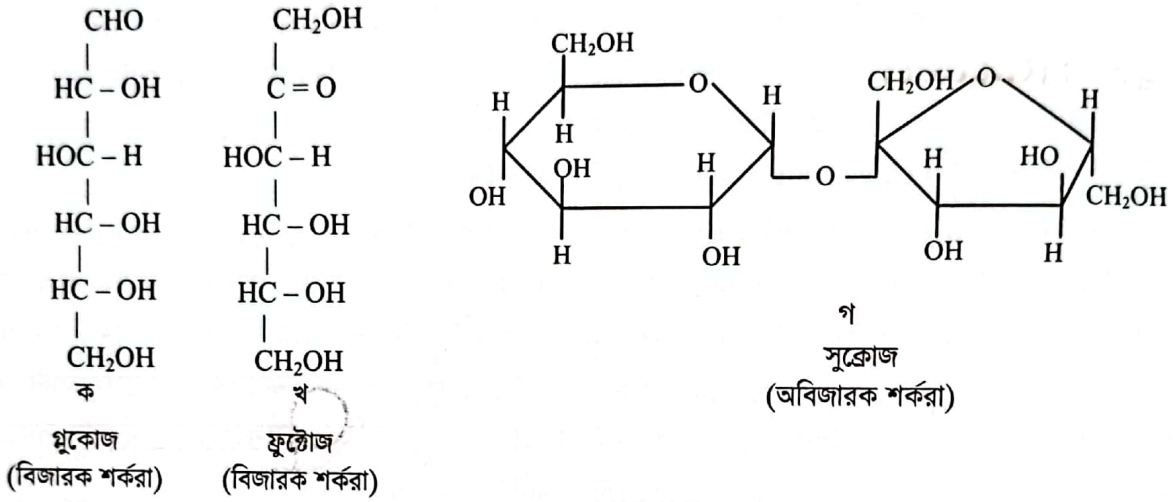

চিত্র-৩.৫: বিজারক শর্করা ও অবিজারক শর্করা

হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose): সেলুলোজ ও পেকটিন পদার্থ ছাড়া স্থলজ উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে অন্যান্য যে হেটেরোপলিস্যাকারাইড থাকে তাদের **হেমিসেলুলোজ** বলে। যেমন- গ্লুকান, জাইলান ইত্যাদি।

কাইটিন: কাইটিন হলো একটি নাইট্রোজেনবিশিষ্ট পলিস্যাকারাইড। এটি এন-অ্যাসিটাইলগ্লুকোসামিন এর পলিমার এবং গ্লুকোজের জাতক। ছত্রাকের কোষ প্রাচীর, কাঁকড়া, লবস্টার ইত্যাদির বহিঃকঙ্কালে কাইটিন থাকে।

কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স: কোনো কার্যকর গ্রুপ যুক্ত হয়ে অথবা মূল গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে যে নতুন কার্বোহাইড্রেটের উদ্ভব হয় তাকে **কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স** বলে। ফ্রুক্টোজ এর OH গ্রুপের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে ফ্রুক্টোজ ১,৬-বিস-ফসফেট তৈরি হয়। OH গ্রুপ অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গ্লুকোসামিন, গ্যালাক্টোসামিন হয়ে থাকে। তরুণাস্থির প্রধান দ্রব্য গ্যালাক্টোসামিন। গ্লুকোসামিন পলিমার হয়ে তৈরি করে কাইটিন, যা পতঙ্গ, কাঁকড়া, লবস্টার এবং ছত্রাকের কোষ প্রাচীরের গাঠনিক পলিস্যাকারাইড। পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে কাইটিন রয়েছে।

দলীয় কাজ

দলগতভাবে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস ছকের মাধ্যমে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করো।

CamScanner

৩.৩ মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা (Monosaccharide or Simple Carbohydrate)

সাধারণভাবে মনোস্যাকারাইডগুলোকে শর্করা বা সরল শর্করা বলে। এতে কার্বনের সংখ্যা ৩ থেকে ১০টি। প্রকৃতিতে যে মনোস্যাকারাইড সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হলো D-গ্লুকোজ। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মনোস্যাকারাইডের বর্ণনা দেওয়া হলো–

৩.৩.১ গ্লুকোজ (Glucose)

গ্লুকোজ এক প্রকার গুরুত্বপূর্ণ হেক্সোজ মনোস্যাকারাইড। গ্লুকোজের অপর নাম **ডেক্সট্রোজ** (dextrose) এবং রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এদের গঠনে অ্যালডিহাইড (–CHO) থাকায় এদের **অ্যালডোহেক্সোজ বলে**। প্রায় সকল মিষ্টি ফল ও মধুতে মুক্ত অবস্থায় একে পাওয়া যায়। পাকা আঙ্গুরে ১২–৩০% গ্লুকোজ থাকে। তাই গ্লুকোজকে **আঙ্গুরের শর্করা** (grape sugar) বলে। গ্লুকোজ পলিমাররূপে স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি তৈরি করে।

উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালি: সকল স্বভোজী উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ সংশ্লেষ করে, যা দ্রুত অন্য যৌগ তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাই এটি সঞ্চিত দ্রব্য হিসেবে থাকে না। আবার, গবেষণাগারে স্টার্চ ও সেলুলোজ আর্দ্রবিশ্লেষণ করে গ্লুকোজ উৎপাদন করা হয়।

বৈশিষ্ট্য: গ্লুকোজ সাদা, দানাদার, মিষ্টি স্বাদযুক্ত। এটি পানিতে দ্রবণীয়, অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে অদ্রবণীয়।

জেনে রাখো

এক অণু সেলুলোজের আর্দ্র বিশ্লেষণে অসংখ্য গ্লুকোজ অণু উৎপন্ন হয়। গ্লুকোজ তাৎক্ষণিক শক্তির উৎস। তাই অসুস্থ ব্যক্তি ও ক্রীড়াবিদগণ দ্রুত শক্তি লাভের জন্য গ্লুকোজের সরবত পান করে থাকেন।

গ্লুকোজের ব্যবহার:

১. দ্রুত শক্তি লাভের জন্য রোগীর পথ্য হিসেবে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
২. অনেক সময় খেলোয়াড়দের দুর্বলতা কাটিয়ে দ্রুত শক্তি পেতে বিরতির সময় গ্লুকোজের সরবত খাওয়ানো হয়।
৩. বিভিন্ন ধরনের ফল সংরক্ষণেও গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
৪. জীবদেহের সঞ্চিত শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত জটিল শর্করা যেমন– স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি তৈরিতে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
৫. শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস চক্রে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয় এবং শ্বসনের শেষে শক্তি উৎপন্ন হয়।
৬. ওষুধ শিল্পে ক্যালসিয়াম গ্লুকানেট হিসেবে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।
৭. ভিটামিন-সি তৈরিতে গ্লুকোজের ব্যবহার রয়েছে।
৮. সরবিটল, বায়ো-ইথানল ইত্যাদি তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।
৯. গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা গ্লাইকোলিপিড তৈরি হয়ে থাকে।
১০. কার্বোহাইড্রেট বিপাকেও গ্লুকোজের ভূমিকা রয়েছে।

গ্লুকোজের রিং স্ট্রাকচার এবং α/β-D গ্লুকোজ

গ্লুকোজের ১নং কার্বন এবং ৫নং কার্বন কাছাকাছি এলে (দ্রবণে সাধারণত কাছাকাছি আসে) এদের মধ্যে একটি অক্সিজেন সেতু (–O–) তৈরি হয়। একই সাথে ১নং কার্বনে একটি –OH গ্রুপ সৃষ্টি হয়। এ –OH গ্রুপটি ১নং

CamScanner

কার্বনের α অথবা β অবস্থানে থাকতে পারে। –OH গ্রুপের এ α এবং β অবস্থানের কারণে গ্লুকোজের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। যেমন— α গ্লুকোজ স্টার্চ গঠন করলেও β গ্লুকোজ সেলুলোজ গঠন করে। উৎপাদিত দ্রব্যের প্রথমটি কোষের সঞ্চয়ী বস্তু কিন্তু দ্বিতীয়টি গাঠনিক বস্তু।

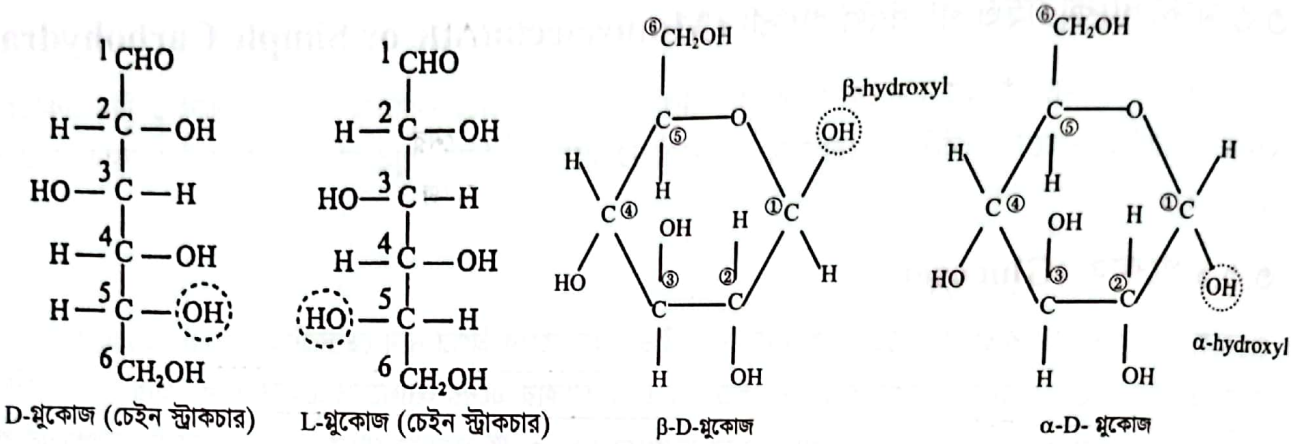

D-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) L-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) β-D-গ্লুকোজ α-D- গ্লুকোজ

চিত্র-৩.৬ : গ্লুকোজ

D এবং L গ্লুকোজ: গ্লুকোজের ৫ নং কার্বন সংযুক্ত (–OH) গ্রুপ ডান দিকে থাকলে তাকে D-গ্লুকোজ বলে। আর সংযুক্ত (–OH) গ্রুপ বাম দিকে থাকলে তাকে L-গ্লুকোজ বলে। তবে উদ্ভিদে সব সময় D-গ্লুকোজ থাকে।

৩.৩.২ ফ্রুক্টোজ (Fructose)

ফ্রুক্টোজ হলো গ্লুকোজের ন্যায় হেক্সোজ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মনোস্যাকারাইড যার রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এর গঠনে কিটো (= CO) গ্রুপ থাকায় একে **কিটোহেক্সোজ** বলে। উদ্ভিদে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ খুব বেশি। ফলের রস, নেকটার এবং মধুতে অধিক পরিমাণে মুক্ত ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। সেজন্যে একে **ফলের চিনি** (fruit sugar) বলে। ফ্রুক্টোজ সমপরিমাণ গ্লুকোজের সাথে যুক্ত হয়ে চিনি গঠন করে। তাই একে আখ ও বীটের কাণ্ডরসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ফ্রুট (fruit) তথা ফল থেকে প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল বলে এর নামকরণ হয়েছিল **ফ্রুক্টোজ**।

বৈশিষ্ট্য: ফ্রুক্টোজ সাদা বর্ণের, সূঁচাকৃতির, দানাদার, স্ফটিকাকার ও মিষ্টি পদার্থ। এটি পানিতে ও গরম অ্যালকোহলে দ্রবণীয়।

ব্যবহার: ১. কনফেকশনারিতে নানা প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য তৈরি করার জন্য ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করা হয়। ২. ক্রিস্টাল জাতীয় ফ্রুক্টোজ বিভিন্ন খাদ্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ৩. এছাড়া সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে সমপরিমাণে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়।

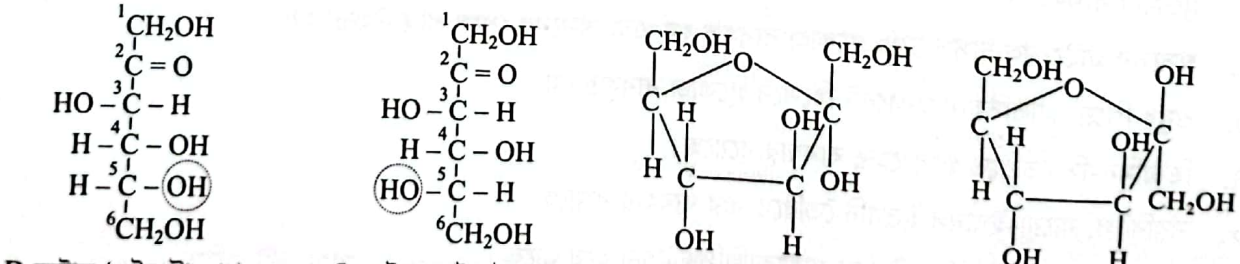

D-ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার) L-ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার) α-D-ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার) β-D-ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার)

চিত্র-৩.৭: ফ্রুক্টোজ

৩.৩.৩ রাইবোজ (Ribose)

এটি একটি পেন্টোজ জাতীয় মনোস্যাকারাইড। এর রাসায়নিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$। এতে একটি (–CHO) গ্রুপ থাকায় এদের **অ্যালডোপেন্টোজ** বলা হয়। সকল জীবকোষে RNA থাকে। এই RNA-র অন্যতম উপাদান হলো

CamScanner

রাইবোজ শর্করা। রাইবোজ শর্করার গলনাঙ্ক ৯৫° সে.। গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে। RNA তে নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিওসাইড তৈরিতে কেবলমাত্র রাইবোজ শ্যুগার অংশগ্রহণ করে। নিউক্লিওসাইডের সাথে একটি অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড গঠিত হয়। কার্বন বিজারণের মাধ্যমে শর্করা তৈরির প্রক্রিয়ায়ও রাইবোজের ভূমিকা রয়েছে। ATP, NAD^+, $NADP^+$, FAD, Co-A ইত্যাদি জৈব অণুর সাথেও রাইবোজ যুক্ত থাকে।

ব্যবহার : ১. রাইবোজ বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিওটাইড গঠন পূর্বক RNA গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় কাজে ভূমিকা রাখে। ২. কতিপয় ভাইরাসে RNA বংশগতীয় বস্তু হিসেবে কাজ করে। ৩. বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইম তৈরিতে রাইবোজ ব্যবহৃত হয়।

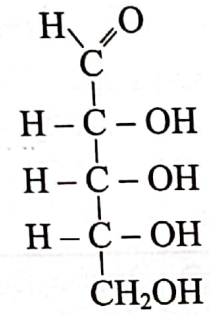

D রাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

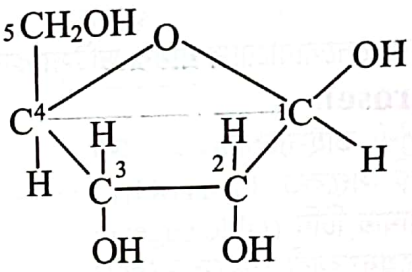

β–D রাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

চিত্র-৩.৮: রাইবোজ

৩.৩.৪ ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose)

এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পেন্টোজ মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_4$। এর গঠনে একটি অ্যালডিহাইড (–CHO) গ্রুপ থাকায় একে **ডিঅক্সিঅ্যালডোপেন্টোজ** বলে। রাইবোজ থেকে এর একমাত্র পার্থক্য হলো ২নং কার্বনে একটি OH এর বদলে H থাকে (অর্থাৎ অক্সিজেন কম থাকে)। এটি DNA-এর গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান এবং ডিঅক্সিরাইবোজযুক্ত নিউক্লিওটাইড DNA-র গাঠনিক একক। এটি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে **লেভুলিনিক অ্যাসিড** উৎপন্ন করে।

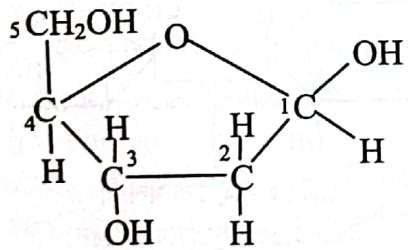

β–D ডিঅক্সিরাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

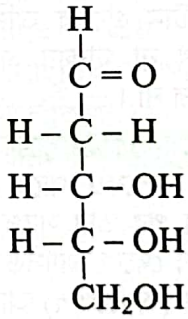

ডিঅক্সিরাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

চিত্র-৩.৯: ডিঅক্সিরাইবোজ

ব্যবহার:

১. DNA-র গঠন কাঠামোতে এই শর্করা ব্যবহার হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কাজের সাথে এটি জড়িত।

২. DNA জীবের বংশগতীয় বস্তু হিসেবে কাজ করে।

শ্রেণির কাজ

রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের মধ্যে পার্থক্য খাতায় লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

CamScanner

পাঠ ৩

ডাইস্যাকারাইড
Disaccharide; Gr. *dis* = twice, *saccharin* = sugar

৩.৪ ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide)

দুইটি মনোস্যাকারাইড তাদের **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী** (একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে অপর একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সংযুক্তি) দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত থেকে ডাইস্যাকারাইড গঠন করে। ডাইস্যাকারাইড প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন- সুক্রোজ, ল্যাকটোজ এবং মল্টোজ। সুক্রোজকে (ডাইস্যাকারাইড) আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়।

$$\underset{\text{সুক্রোজ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

নিচে সুক্রোজ, মল্টোজ এবং সেলোবায়োজ নামক ডাইস্যাকারাইড সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

৩.৪.১ সুক্রোজ (Sucrose)

উদ্ভিদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডাইস্যাকারাইড হলো সুক্রোজ; যার রাসায়নিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। সুক্রোজ হলো মানুষের **খাবার চিনি** (table suger)। সকল প্রকার সালোকসংশ্লেষণকারী উদ্ভিদে সুক্রোজ পাওয়া যায়। তবে আখ, বিট, ম্যাপল, আনারসে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুক্রোজ থাকে। **সবুজ উদ্ভিদের পাতায় প্রস্তুতকৃত শর্করা সুক্রোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়।** মধুর প্রধান কাঁচামাল হলো সুক্রোজ। α-D গ্লুকোজের ১নং কার্বনের OH এবং β-D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের OH এর মাঝে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বা অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) সৃষ্টি হয় এবং ১ অণু পানি অপসারিত হয়ে ১ অণু সুক্রোজ গঠিত হয়। সুক্রোজ নন-রিডিউসিং শ্যুগার। কারণ, সুক্রোজ গঠনের সময় গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের মুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এসব মুক্ত গ্রুপ না থাকায় এরা অন্য যৌগকে জারিত করতে পারে না।

জেনে রাখো

ল্যাক্টোজ: ল্যাক্টোজ একটি ডাইস্যাকারাইড। এটি মূলত দুধে পাওয়া যায়। দুধের ২% - ৪% শর্করাই হলো ল্যাক্টোজ।

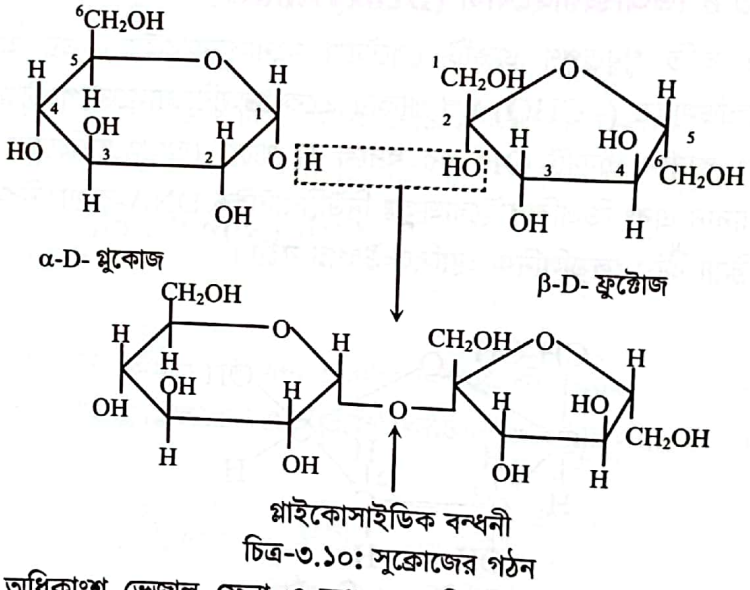

চিত্র-৩.১০: সুক্রোজের গঠন

উৎপাদন: আখের কাণ্ড রসে ১৫% সুক্রোজ, কিছু জৈব অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফসফেট থাকে। পেষণ পদ্ধতিতে রস সংগ্রহ করার পর তার সাথে কলিচুন মিশানো হয়। এর ফলে দ্রবণ থেকে অ্যাসিড প্রশমিত হয়, ফসফেটের তলানি জমে (অধঃক্ষেপ) আর চিনির আর্দ্রবিশ্লেষণ বন্ধ হয়। এরপর দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে অধিকাংশ ভেজাল ফেনা ও অধঃক্ষেপ হিসেবে পৃথক হয়ে যায়। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পরিষ্কার রসকে নিম্নচাপে ঘনীভূত করলে সুক্রোজ-এর স্ফটিক (চিনি) পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য: ১. সুক্রোজ সাদা, দানাদার, মিষ্টি স্বাদযুক্ত ও স্ফটিকাকার পদার্থ। ২. এর গলনাঙ্ক ১৮৮° সে.। ৩. সুক্রোজ পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়। ৪. লঘু অ্যাসিডে সুক্রোজের জলীয় দ্রবণ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ অণু গঠন করে।

ব্যবহার: ১. সুমিষ্ট খাদ্য তৈরিতে সুক্রোজের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি। ২. পরীক্ষাগারে অক্সালিক অ্যাসিড তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। ৩. স্বচ্ছ সাবান তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। ৪. সবুজ পাতায় সৃষ্ট সুক্রোজ উদ্ভিদের খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়।

৩.৪.২ মল্টোজ (Maltose)

মল্টোজ একটি ডাইস্যাকারাইড, এর অপর নাম **মল্ট শ্যুগার**। প্রকৃতিতে মল্টোজ কম পাওয়া যায়। বীজ অঙ্কুরোদগমের সময় স্টার্চ ভাঙ্গানের এক পর্যায়ে মল্টোজ উৎপন্ন হয়। সাধারণত স্টার্চ এর আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে মল্টোজ উৎপন্ন হয়।

CamScanner

দুই অণু α-D গ্লুকোজ α-1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়ে এক অণু মল্টোজ উৎপন্ন করে। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। এর আপেক্ষিক মিষ্টতা-৩২।

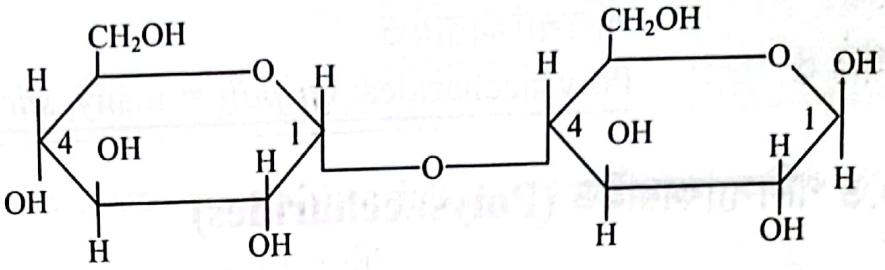

চিত্র-৩.১১: (Maltose) β-মল্টোজ

ধর্ম: মুক্ত অ্যালডিহাইড গ্রুপের উপস্থিতির জন্য মল্টোজ একটি বিজারক (reducing) শর্করা। আর্দ্রবিশ্লেষণে মল্টোজ দুই অণু সমাকৃতির α-গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রাপ্ত **মল্টেজ** এনজাইম এই আর্দ্রবিশ্লেষণে সহায়তা করে।

৩.৪.৩ সেলোবায়োজ (Cellobiose)

কোষ প্রাচীরের একটি সহজলভ্য গাঠনিক উপাদান হলো সেলোবায়োজ। সেলুলোজকে আংশিক আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ক্ষুদ্র সেলোবায়োজ অণু পাওয়া যায়। এটি একটি ডাইস্যাকারাইড। দু'টি গ্লুকোজ অণু তাদের β-1, 4 লিংকেজের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে সেলোবায়োজ এর একটি অণু গঠন করে। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। এটি একটি রিডিউসিং শ্যুগার।

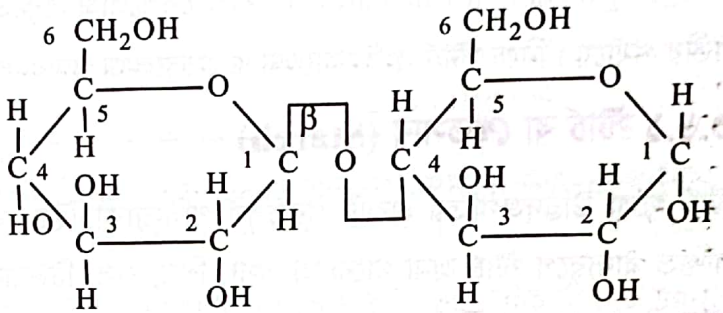

চিত্র-৩.১২: সেলোবায়োজের গাঠনিক সংকেত

উৎপাদন প্রক্রিয়া: সেলুলোজকে আংশিকভাবে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট গঠিত হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম যৌগ হলো সেলোবায়োজ। ইমালসিন এনজাইম এবং অ্যাসিডের প্রভাবে সেলোবায়োজ ভেঙে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত হয়। আবার ব্রোমিন ওয়াটার দিয়ে সেলোবায়োজকে জারিত করলে **সেলোবায়োনিক অ্যাসিড** তৈরি হয়।

ব্যবহার : কোষ প্রাচীর গঠনকারী সেলুলোজের প্রাক দ্রব্য হলো সেলোবায়োজ। অর্থাৎ কোষপ্রাচীর তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

৩.৫ অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharide)

যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ৩-১০ অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাদের বলা হয় **অলিগোস্যাকারাইড** (Gr. oligo = few, saccharin = sugar)। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর মাধ্যমে তিন বা তার অধিক মনোস্যাকারাইড পরস্পর যুক্ত হয়ে অলিগোস্যাকারাইড গঠিত হয়। মনোস্যাকারাইডের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে অলিগোস্যাকারাইডকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন– তিনটি মনোস্যাকারাইড থাকলে ট্রাইস্যাকারাইড, চারটি থাকলে টেট্রাস্যাকারাইড বলা হয়।

১. **ট্রাইস্যাকারাইড (Trisaccharide):** তিনটি মনোস্যাকারাইড যুক্ত হয়ে যে শর্করা গঠন করে তাকে ট্রাইস্যাকারাইড বলে। যেমন- র‍্যাফিনোজ। র‍্যাফিনোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ এবং এক অণু গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়।

$$\underset{\text{র‍্যাফিনোজ}}{C_{18}H_{32}O_{16}} + 2H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{গ্যালাকটোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

২. **টেট্রাস্যাকারাইড (Tetrasaccharide):** যে সকল অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে চার অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাদেরকে টেট্রাস্যাকারাইড বলে। যেমন— স্ট্যাকিওজ (এটি ১ অণু গ্লুকোজ, ১ অণু ফ্রুক্টোজ ও ২ অণু গ্যালাকটোজ নিয়ে গঠিত)।

একক কাজ

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে চিনির গাঠনিক এককগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

CamScanner

পাঠ ৪

পলিস্যাকারাইড
Polysaccharides; *Gr.poly* = many, *saccharin* = sugar

৩.৬ পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides)

দশের অধিক (কয়েকশত হতে কয়েক হাজার) সংখ্যক মনোস্যাকারাইড পলিমারভুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয় তাকে **পলিস্যাকারাইড** বলে। এগুলো বৃহৎ অণুর কার্বোহাইড্রেট। তাই এদেরকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে শত শত বা হাজার হাজার মনোস্যাকারাইড অণু সৃষ্টি হয়। এরা উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট। এগুলো গঠনগতভাবে সরল সূত্র অথবা শাখাযুক্ত সূত্রাকার। পলিস্যাকারাইড হিসেবে সেলুলোজ প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এরপর স্টার্চের পরিমাণ দ্বিতীয় পর্যায়ে। নিচে **স্টার্চ, গ্লাইকোজেন** ও **সেলুলোজ** নামক পলিস্যাকারাইডের বর্ণনা দেওয়া হলো–

৩.৬.১ স্টার্চ বা শ্বেতসার (Starch)

স্টার্চ হলো উদ্ভিদজগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড, যার রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। স্বভোজী উদ্ভিদে সঞ্চিত খাদ্যরূপে স্টার্চ জমা থাকে যা শস্য, শিম, ফল, টিউবার এবং অন্যান্য শাকসবজিতে দেখা যায়। মানুষের প্রধান খাদ্য উপাদান হলো স্টার্চ যা ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

গঠন: প্রাকৃতিক স্টার্চ **অ্যামাইলোজ** (২২%) এবং **অ্যামাইলোপেকটিন** (৭৮%) এর সমন্বয়ে গঠিত। উভয়েই গ্লুকোজের পলিমার এবং দীর্ঘ চেইনযুক্ত। অ্যামাইলোজ শাখাহীন হলেও অ্যামাইলোপেকটিন শাখাযুক্ত। অ্যামাইলোজে সাধারণত ২০০ হতে ১,০০০ এবং অ্যামাইলোপেকটিনে ২,০০০ হতে ২,০০,০০০ গ্লুকোজ অণু থাকে। অ্যামাইলোজে α-D গ্লুকোজ অণুগুলো পরস্পর কার্বনের 1-4 স্থানে সংযুক্ত হয়। তবে অ্যামাইলোপেকটিনের গ্লুকোজ অণুগুলো কার্বনের 1-4 বন্ধন ছাড়াও α-1-6 বন্ধনে যুক্ত হয়ে শাখা গঠন করে। স্টার্চের দীর্ঘ অণু বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের স্থায়ী কণিকা গঠন করে থাকে। স্টার্চ আণুবীক্ষণিক এবং প্রজাতি বিশেষে কণিকার গঠনে পার্থক্য থাকে। যেমন- গোল আলুর স্টার্চ কণিকা বৃহত্তম আর চালের স্টার্চ কণিকা ক্ষুদ্রতম।

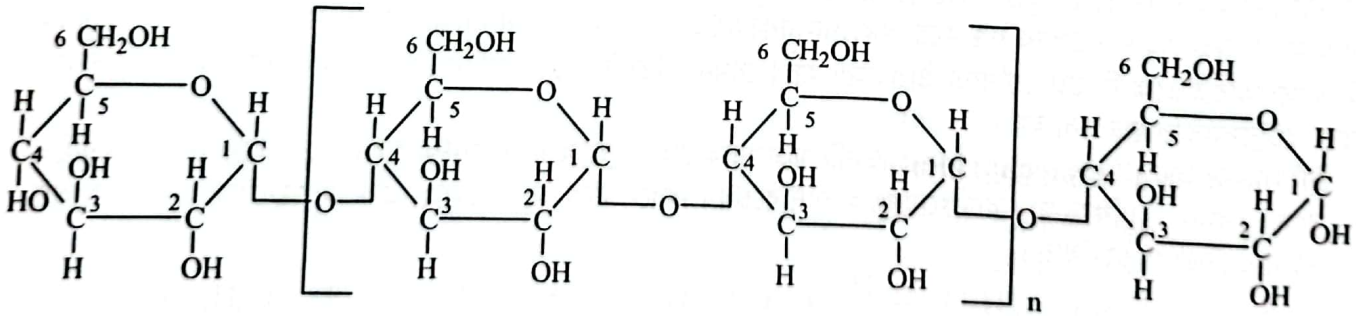

চিত্র-৩.১৩: স্টার্চ এর গঠন (অ্যামাইলোজ)

বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম: ১. স্টার্চ গন্ধহীন, স্বাদহীন, বর্ণহীন এবং সাদা পাউডার জাতীয় পদার্থ। ২. সাধারণ তাপমাত্রায় স্টার্চ পানি, ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়। ৩. আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে। ৪. অ্যাসিড বা এনজাইম দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে প্রথমে ডেক্সট্রিন, পরে মল্টোজ এবং শেষে D-গ্লুকোজে পরিণত হয়। ৫. উচ্চ তাপমাত্রায় শুষ্ক অবস্থায় স্টার্চ ভেঙ্গে বৃহদাকৃতির ডেক্সট্রিন দানায় পরিণত হয়। ৬. স্টার্চ দ্বারা ফেলিং দ্রবণ বিজারিত হয় না।

কাজ: উদ্ভিদদেহে স্টার্চ প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে।

CamScanner

পরীক্ষা: আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে। কারণ স্টার্চের অ্যামাইলোজ উপাদান আয়োডিন অণুকে আবদ্ধ করে জটিল যৌগ গঠন করে। ফলে আয়োডিন পরমাণুগুলোর ইলেকট্রন অরবিটালের পরিবর্তন ঘটে এবং সূর্যালোক শোষণ করে নীল বর্ণ সৃষ্টি করে।

আর্দ্রবিশ্লেষণ: লঘু অ্যাসিড ও এনজাইম (∝-অ্যামাইলোজ) দ্বারা স্টার্চকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে প্রথমে ডেক্সট্রিন, পরে মল্টোজ ও শেষে D-গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

ব্যবহার: ১. স্টার্চ স্বভোজী উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য এবং প্রাণিকুলের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২. গ্লুকোজ, অ্যালকোহল, চোলাই মদ তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। ৩. কাগজ ও আঠা তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। ৪. গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ইত্যাদি তৈরিতে স্টার্চের ব্যবহার রয়েছে। ৫. কর্ন ইথানল উৎপাদনে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

স্টার্চের বাণিজ্যিক ব্যবহার:

- **কাগজ উৎপাদনে:** কাগজ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।
- **খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে:** বিভিন্ন খাদ্যশিল্পে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে স্টার্চের ব্যবহার রয়েছে।
- **ওষুধ শিল্পে:** সক্রিয় উপাদানের বাহক মাধ্যম, ট্যাবলেট ডিসইন্টিগ্যান্ট এবং বাইন্ডার হিসেবে স্টার্চ ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- **কাপড় শিল্পে:** কাপড়কে শক্ত করার জন্য বা গুণগত মানকে বাড়ানোর জন্য কাপড়ে মাড় হিসেবে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।
- **প্রসাধনীতে:** ট্যালকম পাউডারসহ অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে স্টার্চের ব্যবহার রয়েছে।
- **পলিমার উৎপাদনে:** পরিবেশবান্ধব সিন্থেটিক পলিমার উৎপাদনে স্টার্চ ব্যবহার করা হয়।
- **ওয়ার্প সিজিং এজেন্ট তৈরিতে:** তাঁত শিল্পে কাপড় বুননের সময় সুতা ছিঁড়ে যাওয়ার হার কমানোর জন্য ওয়ার্প সিজিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয়, যা মূলত স্টার্চ থেকে তৈরি করা হয়।

৩.৬.২ গ্লাইকোজেন (Glycogen)

গ্লাইকোজেন প্রাণিজগতের গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। উদ্ভিদজগতে শুধু সায়ানোব্যাকটেরিয়া এবং কিছু ছত্রাকে (ইস্ট) সঞ্চিত খাদ্যরূপে গ্লাইকোজেন উপস্থিত। তবে প্রাণীর প্রধান সঞ্চিত খাদ্য (যকৃত ও মাংসপেশিতে) হওয়াতে গ্লাইকোজেনকে **প্রাণিজ স্টার্চ** (animal starch) বলে। ফরাসি শারীরতত্ত্ববিদ **Claude Bernard** ১৮৫৭ সালে সর্বপ্রথম গ্লাইকোজেন আবিষ্কার করেন।

গঠন: গ্লাইকোজেনের আণবিক গঠন বহুলাংশে অ্যামাইলোপেকটিনের মতো, যেমন- α-D গ্লুকোজ অণুগুলো 1-4 বন্ধনীতে সংযুক্ত থাকে। তবে এরা খাটো এবং অনেক বেশি শাখাযুক্ত। এর প্রতিটি শাখায় সাধারণত ১০-২০ টি গ্লুকোজ অণু থাকে। গ্লাইকোজেনকে হাইড্রোলাইসিস করলে শুধুমাত্র α-D গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়।

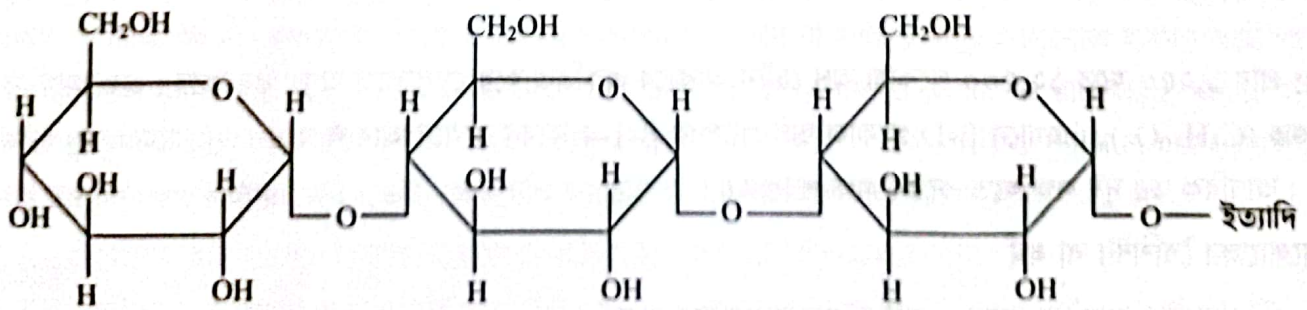

চিত্র-৩.১৪: গ্লাইকোজেন এর গঠন

CamScanner

বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম

১. এটা পাউডার জাতীয় সাদা জৈব রাসায়নিক পদার্থ।
২. সাধারণ তাপমাত্রায় আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে।
৩. তাপ দিলে এর লাল বর্ণ চলে যায়।
৪. পানিতে আংশিক দ্রবণীয়।
৫. ঠান্ডা অবস্থায় কালো বর্ণ ফিরে আসে।
৬. যকৃতের গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয় এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
৭. আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়।
৮. গ্লাইকোজেন ঠান্ডা পানিতে সাসপেনশন তৈরি করে।

গ্লাইকোজেনের কাজ বা ব্যবহার

১. যকৃতে গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হয় যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
২. পেশি অংশের গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে পেশির সংকোচন ও প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।
৩. মস্তিষ্কের কোষে সামান্য গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থেকে মস্তিষ্কের কাজে শক্তি যোগায়।
৪. ভ্রূণীয় শিশুর পালমোনারি কোষে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ফুসফুসের সারফেকট্যান্ট তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
৫. এটি প্রাণিদেহে গ্লুকোজ চক্রের গৌণ সঞ্চিত শক্তির আধার হিসেবে কাজ করে।

৩.৬.৩ সেলুলোজ (Cellulose)

এটি উদ্ভিদজগতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। কারণ স্বভোজী প্রতিটা উদ্ভিদকোষের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরের প্রধান গাঠনিক উপাদান হলো সেলুলোজ। এটি জীবমন্ডলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান জৈব যৌগ। তুলায় ৯৪%, লিনেনে (তিসিতে) ৯০%, কাঠে ৬০%, তৃণলতায় ৩০-৪০% আর জৈব বস্তু সমৃদ্ধ মাটিতে ৪০-৭০% সেলুলোজ থাকে। ফরাসি রসায়নবিদ **Anselme Payen** ১৮৩৮ সালে সেলুলোজ আবিষ্কার করেন। **Kobayashi ও Shode ১৯৯২ সালে সর্বপ্রথম কৃত্রিম সেলুলোজ সংশ্লেষণ করেন।**

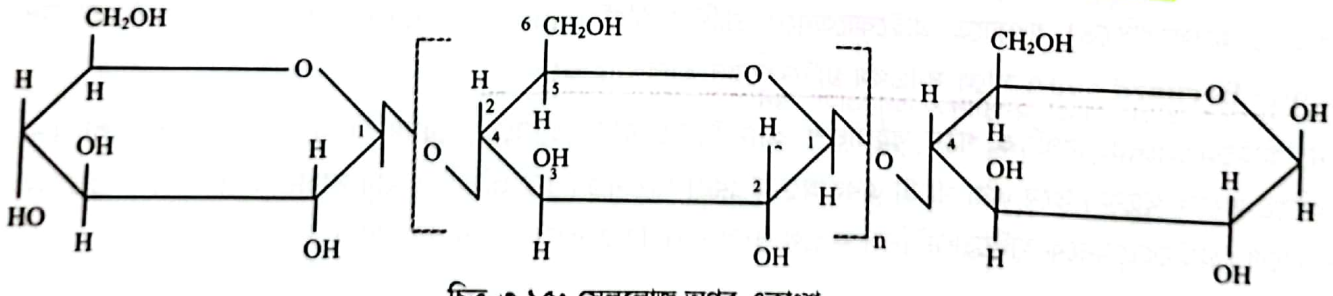

চিত্র-৩.১৫: সেলুলোজ অণুর একাংশ

গঠন: প্রায় ১,২৫০ হতে ১২,৫০০ গ্লুকোজ অণু চেইন আকারে একত্রিত হয়ে সেলুলোজ অণু গঠন করে। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। এখানে β-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর β-1-4 কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজের তন্তু গঠন করে। আণবিক ভর দুই লক্ষ হতে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হয়।

সেলুলোজের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম

i. এটি গন্ধহীন, স্বাদহীন, সাদা ও কঠিন জৈব রাসায়নিক পদার্থ।
ii. সেলুলোজ পানিতে ও জৈব দ্রবণে অদ্রবণীয়।

CamScanner

iii. এরা বিজারণ ক্ষমতাহীন এবং রাসায়নিকভাবে সাধারণত নিষ্ক্রিয়, তবে গাঢ় অ্যাসিডে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়।
iv. এর আণবিক ভর দুই লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ।
v. আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে এরা কোনো রং দেয় না।
vi. এটি মিষ্টি বিবর্জিত এবং ফাইবার সদৃশ।
vii. সেলুলোজের কোনো পুষ্টিগুণ নেই।

সেলুলোজের কাজ

উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের সুরক্ষা প্রদান করা সেলুলোজের প্রধান কাজ। এটি উদ্ভিদের ভার বহনে ভূমিকা রাখে। সেলুলোজ উদ্ভিদের মূল গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

সেলুলোজের ব্যবহার

নিচে সেলুলোজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলো উল্লেখ করা হলো–

i. সেলুলোজ দিয়ে তৈরি তন্তু বস্ত্র শিল্পে প্রধান কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
ii. ঘরবাড়ির আসবাবপত্র, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদিতে পরোক্ষভাবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।
iii. ফিল্টার পেপার, টিস্যু পেপার, প্যাকেজিং এর দ্রব্যসমূহ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।
iv. ফটোগ্রাফিক ফিল্ম তৈরিতে সেলুলোজের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে।
v. নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।
vi. গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
vii. থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।
viii. ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক থেকে তৈরি সেলুলোজ বর্তমানে বায়োটেকনোলজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ix. সেলোফেন ও রেয়ন তৈরিতে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।
x. পানিতে দ্রবণীয় আঠা মিথাইল সেলুলোজ তৈরিতে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।

মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না কেন?

সেলুলোজ এক ধরনের পলিস্যাকারাইড এবং জটিল প্রকৃতির শর্করা। উদ্ভিদ আঁশে এর উপস্থিতি অধিক। যেমন– ঘাস, খড়, উদ্ভিদের ডাটা, পাতা ইত্যাদি। তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন– গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদির পরিপাকতন্ত্রে এক ধরনের মিথোজীবি ব্যাকটেরিয়া বাস করে যারা সেলুলোজ হজমকারী এনজাইম সেলুলেজ তৈরি করে। এ এনজাইম সেলুলোজের β-1-4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী ভেঙ্গে দেয় ফলে তা সরল গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং তৃণভোজী প্রাণীরা তা সহজে হজম করতে পারে।

কিন্তু মানুষের পরিপাকতন্ত্রে এ ধরনের কোনো মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া বাস করে না। ফলে সেখানে সেলুলেজ নামক এনজাইমও তৈরি হয় না। সেলুলেজ নামক এনজাইম পাকস্থলিতে তৈরি না হওয়ায় মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না। সেলুলোজ হজম করতে না পারলেও মানুষের খাদ্য তালিকায় সেলুলোজযুক্ত খাবার বা রাফেজযুক্ত খাবার থাকা আবশ্যক। কারণ সেলুলোজ পানি শোষণ করে মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। সেলুলোজযুক্ত খাবার রক্তনালিতে চর্বি জমার হার কমায়, পাশাপাশি ক্যান্সারের আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস করে।

বাড়ির কাজ

স্টার্চ ও সেলুলোজ এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

CamScanner

পাঠ ৫

অ্যামিনো অ্যাসিড ও প্রোটিন বা আমিষ
Amino Acid and Protein

৩.৭ অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acid)

অ্যামিনো অ্যাসিড হলো প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী Emil Fischer ও Franz Hofmeister, ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম প্রোটিন অণুর গাঠনিক একক হিসেবে **অ্যামিনো অ্যাসিড** আবিষ্কার করেন। অ্যামিনো অ্যাসিডে এক বা একাধিক অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) এবং এক বা একাধিক কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) থাকে। অর্থাৎ এক বা একাধিক অ্যামিনো গ্রুপ ও কার্বোক্সিল গ্রুপযুক্ত জৈব অ্যাসিডকে বলা হয় **অ্যামিনো অ্যাসিড**। অ্যামিনো অ্যাসিডের যে কার্বন পরমাণুর সাথে কার্বোক্সিল গ্রুপ যুক্ত থাকে তাকে α-কার্বন বলে। α-কার্বনের সাথে অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ যুক্ত থাকে বলে অ্যামিনো অ্যাসিডকে অনেক সময় **আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড** বলা হয়। সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিনে (ইনসুলিন) ৫১টি এবং বৃহৎ প্রোটিনে ৪০,০০০ অ্যামিনো অ্যাসিড থাকতে পারে। জীবদেহে ৫০০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গেলেও সকল প্রকার প্রোটিনে মাত্র ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড দেখতে পাওয়া যায়।

৩.৭.১ অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন (General Structure of Amino Acid)

অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠনে দেখা যায় কার্বোক্সিল ($-COOH$) গ্রুপটি একটি কার্বনের সাথে যুক্ত রয়েছে, একে α-কার্বন বলা হয়। আবার অ্যামিনো গ্রুপটি ($-NH_2$) α-কার্বনের অন্যদিকে যুক্ত থাকে। কার্বোক্সিল গ্রুপটি α-কার্বনের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে একে বলা হয় α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

৩.৭.২ অ্যামিনো অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure of Amino Acid)

অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত হলো $R\text{-}CH.NH_2.COOH$। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$), একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা কার্বনযুক্ত কোনো জৈব যৌগ (R) থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণু বা কার্বনযুক্ত জৈব যৌগকে পার্শ্বশিকল গ্রুপও (R) বলা হয়।

অ্যামিনো গ্রুপ এবং কার্বোক্সিল গ্রুপ α-কার্বন নামক একটি কেন্দ্রীয় কার্বন অণুর সাথে যুক্ত থাকে। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কাঠামো হলো C–C–N। প্রকৃতিতে অধিকাংশ অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

α-কার্বনে সংযুক্ত R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন রকম হয়। যেমন–

R-গ্রুপ CH_2SH হলে অ্যামিনো অ্যাসিডটি হবে– সিস্টিন।

R-গ্রুপ CH_2OH হলে অ্যামিনো অ্যাসিডটি হবে– সিরিন।

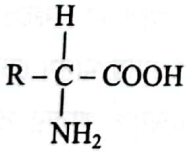

চিত্র-৩.১৬: একটি অ্যামিনো অ্যাসিড

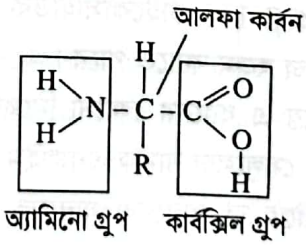

চিত্র-৩.১৭: অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন

৩.৭.৩ অ্যামিনো অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Amino Acid)

১. অ্যামিনো অ্যাসিড সাধারণত পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

২. এরা স্বাদহীন, মিষ্টি বা তিক্ত পদার্থ।

৩. এদের গলনাঙ্ক উচ্চ।

CamScanner

৪. এরা বর্ণহীন, স্ফটিকাকার পদার্থ।

৫. মৃদু অ্যাসিড বা ক্ষারে এরা লবণ সৃষ্টি করে।

৬. বিশুদ্ধ প্রোটিনকে হাইড্রোলাইসিস করলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

৭. অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুতে একটি অ্যাসিডমূলক (–COOH) ও একটি ক্ষারীয়মূলক ($-NH_2$) থাকায় এরা উভধর্মী।

৮. অ্যামিনো অ্যাসিডে **জুইটার** আয়ন দেখা যায়।

৯. একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে।

১০. মানবদেহের অধিকাংশ অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

৩.৭.৪ অ্যামিনো অ্যাসিডের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Amino Acid)

জীবদেহে প্রধান ২০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে প্রোটিন তৈরি করে। জীবদেহের প্রধান এ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড অ্যামিনো অ্যাসিড। অ্যামিনো অ্যাসিডকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়। যেমন–

ক. মানবদেহে প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. **অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড:** এ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো মানবদেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ৯টি। এরা হলো– হিস্টিডিন, আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মেথিওনিন, ফিনাইল অ্যালানিন, থ্রিওনিন, ট্রিপটোফ্যান এবং ভ্যালিন। এগুলো দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না। বিভিন্ন খাদ্যের সাথে মানুষ এ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো গ্রহণ করে থাকে।

২. **অনাত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড:** এ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো দেহাভ্যন্তরে তৈরি হয়। খাদ্যের সাথে এদের গ্রহণ না করলেও মানবদেহের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। এ সকল অ্যামিনো অ্যাসিডকে বলা হয় অনাত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড। অনাত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ১১টি। এগুলো হলো– অ্যালানিন, অ্যাসপ্যারাজিন, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড, আরজিনিন, সিস্টিন, গ্লুটামিন, টাইরোসিন, গ্লাইসিন, প্রোলিন এবং সেরিন।

খ. রাসায়নিক গঠন ও কাজের উপর ভিত্তি করে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. **অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড:** যে সকল অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি অর্থাৎ R-গ্রুপটি অ্যালিফ্যাটিক যৌগের তাদের **অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো** অ্যাসিড বলে। যেমন- গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন ইত্যাদি। গ্লাইসিন মানব শরীরে আবশ্যক হলেও অত্যাবশ্যক নয়।

২. **অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড:** অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি অর্থাৎ R-গ্রুপটি অ্যারোমেটিক যৌগের হলে তাকে **অ্যারোমেটিক অ্যামিনো** অ্যাসিড বলে। যেমন– ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন ইত্যাদি।

৩. **হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড:** অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে যে সকল অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন থেকে ভিন্ন তাদের বলা হয় **হেটেরোসাইক্লিক** অ্যামিনো অ্যাসিড। যেমন– ট্রিপটোফ্যান, প্রোলিন, হিস্টিডিন ইত্যাদি।

গ. প্রোটিন তৈরির উপর ভিত্তি করে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. **প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড:** প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী অ্যামিনো অ্যাসিডকে বলা হয় প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড। উল্লিখিত ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডই প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড।

২. **নন-প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড:** যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে না তাদের নন-প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন– অরনিথিন, সাইট্রুলিন, হেমোসেরিন প্রভৃতি।

CamScanner

২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের নামের তালিকা

	অ্যামিনো অ্যাসিড	সংক্ষিপ্ত নাম	
১	লিউসিন	Leu	L
২	আইসোলিউসিন	Ile	I
৩	লাইসিন	Lys	K
৪	মেথিওনিন	Met	M
৫	ভ্যালিন	Val	V
৬	সেরিন	Ser	S
৭	প্রোলিন	Pro	P
৮	থ্রিওনিন	Thr	T
৯	অ্যালানিন	Ala	A
১০	টাইরোসিন	Tyr	Y

	অ্যামিনো অ্যাসিড	সংক্ষিপ্ত নাম	
১১	হিস্টিডিন	His	H
১২	অ্যাসপারাজিন	Asn	N
১৩	সিস্টিন	Cys	C
১৪	আরজিনিন	Arg	R
১৫	গ্লাইসিন	Gly	G
১৬	ট্রিপ্টোফ্যান	Trp	W
১৭	গ্লুটামিন	Gln	Q
১৮	গ্লুটামিক অ্যাসিড	Glu	E
১৯	অ্যাসপারটিক অ্যাসিড	Asp	D
২০	ফিনাইল অ্যালানিন	Phe	F

৩.৭.৫ অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ (Functions of Amino Acid)

১. অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন তৈরিতে কাঠামোগত একক হিসেবে কাজ করে থাকে।
২. লিপোপ্রোটিন হিসেবে কোষগঠন তথা জীবদেহ গঠনে অংশ নেয়।
৩. ইউরিয়া সংশ্লেষণে অ্যামিনো অ্যাসিড সহায়তা করে।
৪. জীবদেহে pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
৫. প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে এনজাইম, হরমোন, অ্যান্টিবডি প্রভৃতির কাজে অংশ নেয়।
৬. দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৭. মেলানিন রঞ্জক তৈরিতে অ্যামিনো অ্যাসিড বিশেষ ভূমিকা রাখে।
৮. কিছু ভিটামিন, এনজাইম, ইনডোল হরমোন ইত্যাদি সংশ্লেষণে সাহায্য করে।
৯. কিছু নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড রক্তের প্রয়োজনীয় উপাদান প্লাজমা প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।
১০. মায়ের দুধ তৈরিতে স্তনগ্রন্থির বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড দুধ তৈরির প্রোটিন ক্যাসিনোজেন সংশ্লেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৮ প্রোটিন বা আমিষ (Protein)

অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে একের পর এক শাখাহীন শৃঙ্খলের মতো সংযুক্ত হয়ে যে বৃহদাকার অণু গঠন করে তাকে **আমিষ বা প্রোটিন** বলে। খুব সহজভাবে বললে, **অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারই হলো আমিষ বা প্রোটিন**। এ কারণে প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে শুধু অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। প্রোটিন জীবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এ পদার্থ প্রতিটা জীবকোষ গঠন, কোষের সক্রিয়তা তথা বিপাক এবং বংশগতির সাথে জড়িত। অন্যভাবে বলা যায় যে, অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে পেপটাইড বন্ধনীর (–CONH–) মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যে বৃহৎ অণু গঠন করে তাকে প্রোটিন বলে। গ্রিক শব্দ *Proteios* অর্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (first class), যা থেকে protein শব্দের উদ্ভব। ১৮৩৯ সালে মুল্ডার (G. Mulder) সর্বপ্রথম প্রোটিন শব্দ প্রবর্তন করেন।

CamScanner

৩.৮.১ প্রোটিনের বিস্তার (Distribution of Protein)

প্রোটিন সকল প্রকার জীবদেহের গুরুত্বপূর্ণ জৈববস্তু। একে কোষপর্দাসহ কোষীয় বিভিন্ন অঙ্গাণুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে দেখা যায়। জীবদেহের বিপাকীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইম, হরমোন হিসেবে, এমনকি জীবদেহের প্রতিরক্ষাকারী উপাদান অ্যান্টিবডি প্রোটিন দিয়ে তৈরি। সব এনজাইম প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়। দুধ ও ডিম উৎকৃষ্ট প্রোটিন জাতীয় খাবার। জীবদেহের শুষ্ক ওজনের ৫০% প্রোটিন।

৩.৮.২ প্রোটিনের গঠন (Structure of Protein)

প্রোটিনের গাঠনিক একক হলো অ্যামিনো অ্যাসিড। কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ পলিপেপটাইড শিকল গঠন করে। মূলত এ পলিপেপটাইড শিকলই হলো প্রোটিন। পলিপেপটাইড শিকলে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) পার্শ্ববর্তী অপর অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল ($-COOH$) গ্রুপের α-কার্বনের সাথে পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত থাকে। প্রতিটি পেপটাইড বন্ধনী তৈরিতে এক অণু পানি নির্গত হয়। প্রোটিনের গাঠনিক একক অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ ($-NH_2$) এবং অম্লীয় গ্রুপ ($-COOH$) থাকে বলে প্রোটিন একই সাথে ক্ষারীয় এবং অম্লীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এ কারণে প্রোটিনকে বলা হয় **অ্যাম্ফিটেরিক** অণু (amphiteric)। একটি পলিপেপটাইড শিকলে কমপক্ষে ৫০টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ। প্রোটিনের পলিপেপটাইড শিকলের প্রান্ত দুটি উন্মুক্ত থাকে। এদের এক প্রান্তকে N প্রান্ত (অ্যামাইন প্রান্ত) এবং অপর প্রান্তকে C প্রান্ত (কার্বোক্সিল প্রান্ত) বলে।

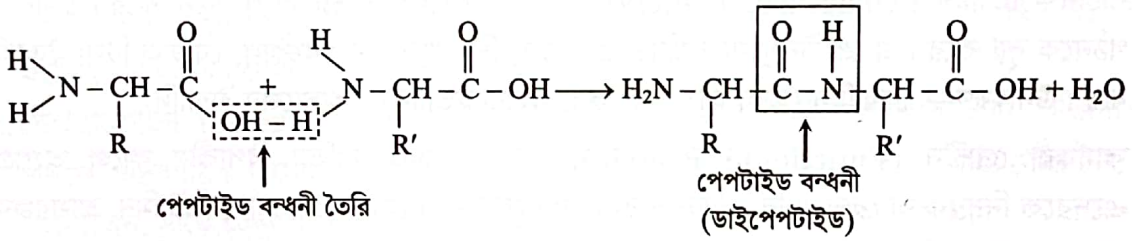

চিত্র-৩.১৮: প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন

প্রাণরসায়নবিদগণ প্রোটিনে নিম্নলিখিত চার ধরনের গঠন পর্যবেক্ষণ করেছেন–

১. **প্রাইমারি গঠন:** পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের রৈখিক পলিপেপটাইড শিকল হলো প্রোটিনের প্রাইমারি গঠন। উদাহরণ– ইনসুলিন।

২. **সেকেন্ডারি গঠন:** পলিপেপটাইড শিকল নিয়মিত ভাঁজ খেয়ে প্রোটিনের যে গঠন সৃষ্টি করে তাকে সেকেন্ডারি গঠন বলে। এদের সাধারণত α-হেলিক্স ও β-প্লিটেড ধরনের শিকল থাকে। উদাহরণ– কেরাটিন, সিল্ক।

৩. **টারসিয়ারি গঠন:** অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ পলিপেপটাইড শিকলে ত্রিমাত্রিক সজ্জায় বিন্যস্ত থাকলে তাকে টারসিয়ারি গঠন বলে। উদাহরণ– ফাইব্রিনোজেন।

৪. **কোয়ার্টানারি গঠন:** দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড শিকল ডাইসালফেট বা হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে যে প্রোটিন গঠন করে তাকে কোয়ার্টানারি গঠন বলে। উদাহরণ-হিমোগ্লোবিন (এতে দুটি α শিকল ও দুটি β শিকল বিদ্যমান)।

সংশ্লেষণ স্থান: কোষস্থ রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

৩.৮.৩ প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Protein)

১. প্রোটিন বর্ণহীন, কলয়েড প্রকৃতির এবং স্ফটিকাকার।
২. এটি পানিতে, পাতলা অ্যাসিডে, ক্ষার এবং মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয়।
৩. নানা প্রকার ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে পরিবর্তন ঘটে।

CamScanner

৪. প্রোটিন মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। এছাড়া এতে সালফার, ফসফরাস, লোহা ও তামা থাকে।
৫. প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।
৬. অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন জমাট বাঁধে।
৭. প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।
৮. প্রোটিনের মনোমার অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ ($-NH_2$) এবং অম্লীয় গ্রুপ ($-COOH$) থাকে বলে এটি একই সাথে ক্ষারীয় ও অম্লীয় উভয় গুণ প্রকাশ করে। এজন্য একে অ্যাম্ফিটেরিক প্রোটিন বলে।
৯. বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতি ও আণবিক গঠনে পরিবর্তন ঘটে।
১০. প্রোটিন সকল জীবকোষের মৌলিক উপাদান এবং উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ।

৩.৮.৪ প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Protein)

Escherichia coli এর ১টি কোষে ৩,০০০ ধরনের প্রোটিন থাকে। মানবদেহে প্রায় ১ লক্ষ ধরনের প্রোটিন আছে যা *E. coli* এর প্রোটিন থেকে আলাদা। তাই প্রোটিনের বিশাল রাজ্যে শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি বিভিন্ন প্রকার হয়। শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি উল্লেখপূর্বক নিচে প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো–

ক. জৈবিক কার্যাবলির ভিত্তিতে প্রোটিন দু'ধরনের। যথা-

১. **গাঠনিক প্রোটিন (Structural Protein):** এরা জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে। কোষ এবং টিস্যুর গঠনকে দৃঢ় করে। এ প্রোটিনগুলো প্রধানত ত্বক, চুল, শিং, ক্ষুর, অন্তঃকঙ্কাল, যোজক টিস্যু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ— কেরাটিন (ত্বক, শিং, নখ, ক্ষুর, পালক ইত্যাদি), কোলাজেন ইত্যাদি।

২. **কার্যকরী প্রোটিন (Functional Protein):** এরা জীবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে নিয়ন্ত্রক বা রেগুলেটরি প্রোটিনও বলা হয়। যেমন- এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন, শ্বাসরঞ্জক ইত্যাদি।

খ. আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন দু'ধরনের। যথা–

১. **তন্তুময় প্রোটিন (Fibrous Protein):** যখন পলিপেপটাইডগুলো প্রোটিনে সমান্তরালভাবে একই অক্ষ বরাবর সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে। এমন আকৃতির প্রোটিনকে তন্তুময় প্রোটিন বলে। যেমন- কেরাটিন, ফাইব্রাইন, কোলাজেন ইত্যাদি।

২. **গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular Protein):** যেসব প্রোটিনের গঠন গোলাকৃতির হয় তাদের গ্লোবিউলার প্রোটিন বলে। যেমন- মায়োগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন, ইনসুলিন ইত্যাদি।

গ. গঠন অনুসারে প্রোটিন চার প্রকার। যথা– ১. প্রাইমারি, ২. সেকেন্ডারি, ৩. টারশিয়ারি, ৪, কোয়ার্টারনারি।

ঘ. ভৌত রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিন তিন প্রকার। যথা- ১. সরল প্রোটিন, ২. যুগ্ম প্রোটিন এবং ৩. উদ্ভূত প্রোটিন বা প্রোটিনের জাতক।

১. **সরল প্রোটিন (Simple Protein):** এ ধরনের প্রোটিন রাসায়নিকভাবে শুধু অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। তাই যে প্রোটিন এনজাইম বা অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে শুধু অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তাকে সরল প্রোটিন বলে। দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে সরল প্রোটিন ৭ প্রকার।

i. **অ্যালবুমিন (Albumin):** এদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এরা পানিতে দ্রবণীয় এবং ঘোলাটে দ্রবণ তৈরি করে। এছাড়া লঘু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় এবং তাপে জমাট বাঁধে। প্রকৃতিতে এদের ব্যাপক পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন- গম বীজে লিউকোসিন, শিম বীজে লিগুমেলিন, ডিমের সাদা অংশে ওভালবুমিন (১০–১২%) নামক বিভিন্ন প্রকার অ্যালবুমিন থাকে। এছাড়া রক্তরস ও লসিকায় সিরাম-অ্যালবুমিন (৪-৫%), দুধে ল্যাকটালবুমিন, মাংসপেশিতে মায়ো-অ্যালবুমিন থাকে।

CamScanner

ii. **গ্লোবিউলিন (Globulin):** এ ধরনের প্রোটিন পানিতে অদ্রবণীয়, লঘু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় এবং তাপে জমাট বাঁধে। বীজে সঞ্চিত প্রোটিন রূপে এদের বেশি পাওয়া যায়। যেমন- চিনাবাদামে এরাচিন, আলুতে টিউবেরিন। এছাড়া শন পাট, তুলা ইত্যাদির আঁশে এন্ডেস্টিন, মটর বীজে লেগুলিন নামক গ্লোবিউলিন থাকে। আবার, ডিমের কুসুমে ওভোগ্লোবিউলিন, রক্তরসে সিরাম গ্লোবিউলিন দেখা যায়।

iii. **গ্লুটেলিন (Glutelin):** এরা পানি, লবণ এবং নিরপেক্ষ দ্রাবকে অদ্রবণীয় তবে লঘু অ্যাসিড এবং ক্ষারকে দ্রবণীয়। তাপে জমাট বাঁধে না। এদের উপস্থিতি শুধু দানাদার শস্যে সীমিত। যেমন- গমে **গ্লুটেনিন**, চালে **অরাইজেনিন** ইত্যাদি গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ।

iv. **প্রোলামিন (Prolamin):** পানি এবং বিশুদ্ধ অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ৭০-৮০% ইথানলে দ্রবণীয়। তাপে জমাট বাঁধে না। এরা শুধু বীজে থাকে। এদের আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে **অ্যামোনিয়া** এবং **প্রোলিন** পাওয়া যায়। যেমন- গমে **গ্লিয়াডিন**, ভুট্টায় **জেইন** এবং বার্লির **হর্ডিন** ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রোলামিন।

v. **প্রোটামিন (Protamine):** এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন যা পানিতে, লঘু অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবণীয়। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এদের ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের (যেমন– আরজিনিন) পরিমাণ বেশি থাকে। এ ধরনের প্রোটিন সাধারণত নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে থাকে। উদাহরণ: স্যামন মাছের শুক্রাণুতে **সালমিন** নামক প্রোটামিন থাকে।

vi. **হিস্টোন (Histone):** এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে অদ্রবণীয়। এরা ক্ষারীয় প্রকৃতির তবে তাপে সহজে জমাট বাঁধে না। জিনের রেগুলেশনে হিস্টোনের ভূমিকা রয়েছে। এরা সাধারণত নিউক্লিয়াসে থাকে। যেমন- নিউক্লিয়াসের **নিউক্লিওহিস্টোন**।

vii. **স্ক্লেরোপ্রোটিন (Scleroprotein):** এরা পানি, লবণের দ্রবণ, অ্যাসিড, ক্ষার এবং অন্যান্য সাধারণ দ্রাবকে অদ্রবণীয়। এদের শুধু প্রাণিদেহেই পাওয়া যায়। যেমন– শিং, নখ, খুরে **কেরাটিন**, চামড়ায় **কোলাজেন**, হাড়ে **টেনডন** প্রভৃতি এ ধরনের প্রোটিন।

২. **যুগ্ম প্রোটিন (Conjugated Protein):** যেসব প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক যৌগ বা ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত তাদের যুগ্ম প্রোটিন বলে। অ্যামিনো অ্যাসিড নয় এমন অংশকে **প্রোস্থেটিক গ্রুপ** বলা হয়। প্রোস্থেটিক গ্রুপের ভিত্তিতে এরা নিম্নলিখিত প্রকারের—

i. **নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoprotein):** এখানে প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। এরা পানিতে দ্রবণীয় এবং সামান্য অম্লীয়। এদের ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়।

ii. **গ্লাইকোপ্রোটিন (Glycoprotein):** যে যুগ্ম প্রোটিনের প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে কার্বোহাইড্রেট (বিশেষত মনোস্যাকারাইড) থাকে তাকে গ্লাইকোপ্রোটিন বলে। এরা ক্ষারে দ্রবণীয় এবং অম্লীয় স্বভাবের। কোষপর্দা, জেলিফিশ ও লালাতে এ ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়।

iii. **লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein):** প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে এখানে লিপিড থাকে। এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে অদ্রবণীয়। কোষপর্দাসহ বিভিন্ন অঙ্গাণুর আবরণ লিপোপ্রোটিন দিয়ে তৈরি।

iv. **ক্রোমোপ্রোটিন (Chromoprotein):** এ ধরনের যুগ্ম প্রোটিনে প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিন, ক্লোরোফিল, বিলিপ্রোটিন, ক্যারোটিনয়েড প্রভৃতি ক্রোমোপ্রোটিনের উদাহরণ।

v. **ফসফোপ্রোটিন (Phosphoprotein):** প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক অ্যাসিড থাকে। এরা পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু ক্ষারকে দ্রবণীয়। যেমন- দুধের কেসিনোজেন, ডিমের ভাইটেলিন।

vi. **মেটালোপ্রোটিন (Metaloprotein):** প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে যে কোনো ধাতব আয়ন (Fe, Mn, Mg, Zn) থাকে। যেমন- লোহা সমৃদ্ধ প্রোটিন হলো **ফেরোডক্সিন**, জিংক সমৃদ্ধ হরমোন হলো **ইনসুলিন**। এছাড়া সিডারোফিলিন ও সেলোপ্লাজিমিন মেটালোপ্রোটিনের অন্য দুটি উদাহরণ।

CamScanner

vii. **ফ্ল্যাভোপ্রোটিন (Flavoprotein):** এ ধরনের প্রোটিনগুলো ফ্ল্যাভিন যৌগ তথা FAD (Flavin Adenine Dinucloetide) এর সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

viii. **লৌহ-পোরফাইরিন প্রোটিন (Iron-Porphyrine Proteins):** এ ধরনের প্রোটিন Iron-porphyrin যৌগ তথা সাইটোক্রোম এর সাথে যুক্ত থাকে।

৩. **উদ্ভূত প্রোটিন বা প্রোটিনের জাতক (Derived Protein):** যে সকল প্রোটিন জাতীয় যৌগ প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রোটিনের উপর এনজাইম, অ্যাসিড, ক্ষারক বা তাপ-এর ক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় সে সকল প্রোটিনকে উদ্ভূত প্রোটিন বলে। যেমন– ফাইব্রিন, প্রোটিয়োজ, পেপটোন ইত্যাদি। কৃত্রিমভাবে উদ্ভূত পলিপেপটাইড এদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- মায়োসিন থেকে **মায়োসান** সৃষ্টি হয়। অ্যালবুমিন হতে **অ্যালবুমাস** সৃষ্টি হয়।

৬. গুণগত মানের ভিত্তিতে প্রোটিন দু'প্রকার-

১. **প্রথম শ্রেণির প্রোটিন:** যে প্রোটিনে সবকটি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড (৯টি) পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে এদের **প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বা সম্পূর্ণ** প্রোটিন বলে। যেমন– মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, বাদাম, সয়াবিনসহ অধিকাংশ প্রাণিজ প্রোটিন।

২. **দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন:** যেসব প্রোটিনে সবগুলো অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না তাদের **দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বা অসম্পূর্ণ প্রোটিন** বলে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মূলত দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন।

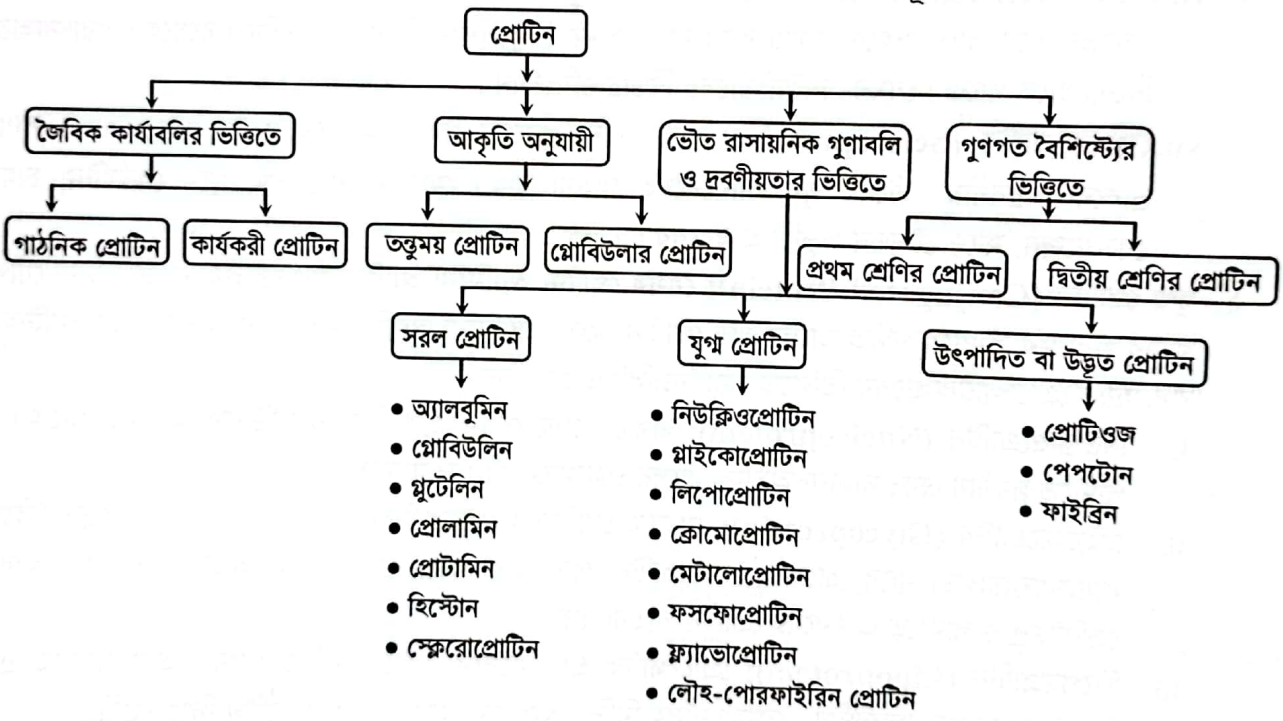

৩.৮.৫ প্রোটিনের কাজ (Functions of Protein)

১. কোষঝিল্লি এবং বিভিন্ন অঙ্গাণু গঠন করা এদের কাজ।

২. জীবদেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপন্ন করে।

৩. যে সকল উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রোটিন থাকে তারা অনেক পশুপাখির আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

৪. নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে হিস্টোন প্রোটিন।

৫. প্রাণিদেহের সমস্ত কোষে O_2 পরিবহন করে হিমোগ্লোবিন প্রোটিন।

৬. ইন্টারফেরন (interferon) একটি কোষীয় প্রোটিন যা ভাইরাস আক্রমণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে তৈরি হয়। ধারণা করা হচ্ছে ইন্টারফেরন ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যাবে।

CamScanner

৭. ডিফেনসিভ (defensive) অ্যান্টিবডি হিসেবে মানবদেহের পেপটাইড থেকে উৎপাদিত প্রোটিন কাজ করে।
৮. জীবদেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৯. কোষে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে প্রোটিন কাজ করে এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে।
১০. এনজাইম হিসেবে কাজ করে জীবদেহকে সচল রাখে।
১১. এরা সাধারণত অ্যান্টিবডির গাঠনিক উপাদান হিসেবে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে।
১২. কিছু প্রোটিন বিষাক্ত হওয়ায় অনেক জীব তা খেয়ে মারা যায় (সাপের বিষের প্রোটিন)।
১৩. নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিক অ্যাসিডকে সক্রিয় করতে হিস্টোন প্রোটিন বিশেষ ভূমিকা রাখে।
১৪. উদ্ভিদের রঞ্জক তৈরিতে বিভিন্ন প্রোটিন কাজ করে। যেমন– রডোপসিন।

৩.৮.৬ জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা বা গুরুত্ব (Roles of Protein in Living Body)

জীবদেহে প্রোটিনের গুরুত্ব অন্য সকল পদার্থ থেকে বেশি। নিচে প্রোটিনের বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো উল্লেখ করা হলো-

- **এনজাইমের ভূমিকা:** জীবদেহের অভ্যন্তরে সংঘটিত সকল বিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এনজাইমের প্রধান উপাদান প্রোটিন। এনজাইম অনুঘটক হিসেবে প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে যা জীবের জন্য অপরিহার্য।
- **গাঠনিক ভূমিকা:** তন্তুজ প্রোটিন বিভিন্ন অঙ্গের আবরণী তৈরি, বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে। কোলাজেন নামক প্রোটিন টেনডনের মূল উপাদান যা অস্থির সাথে পেশির সংযোগ স্থাপন করে।
- **বংশগতিতে ভূমিকা:** DNA তে সংরক্ষিত বংশগতির তথ্য প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রোটিন এনজাইম গঠনের মাধ্যমে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়, যা শেষ পর্যন্ত ফিনোটাইপ প্রকাশ করে। এজন্য প্রোটিনকে **জীবনের ভাষা** বলা হয়।
- **পরিবহনে ভূমিকা:** কোষ অভ্যন্তরে বিভিন্ন অণুর পরিবহন, আয়ন স্থানান্তর প্রভৃতি প্রোটিনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এছাড়া হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন প্রাণিদেহের সকল কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে।
- **জীবদেহ গঠনে ভূমিকা:** জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোন বিশেষ ধরনের প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
- **বিষক্রিয়া ও আত্মরক্ষা:** বিভিন্ন জীবে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় প্রোটিন থেকে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থ জীবের আত্মরক্ষার জন্য সহায়ক। যেমন- সাপের বিষ বা ভেনম যা সাপের আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
- **ভাইরাস ও ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা:** বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এর কারণ হিসেবে ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছে। ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন ভাইরাস প্রতিরোধক হিসেবে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।
- **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন:** অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বিপাকীয় বিক্রিয়ায় জীবদেহে এসব অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন হয়। অ্যান্টিবায়োটিক মূলত প্রোটিন থেকেই তৈরি হয়।
- **ইমিউনিটি:** রোগ জীবাণু ধ্বংস ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পোষক দেহে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, তা সংশ্লেষ করতে প্রোটিন প্রয়োজন।
- **ব্যথানাশক হিসেবে ভূমিকা:** মস্তিষ্কে উৎপন্ন এন্ডোরফিন ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে যা বিশেষ ধরনের প্রোটিন।
- **ঘুম সৃষ্টিতে ভূমিকা:** সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘুম আনয়নকারী s-factor বিশেষ ধরনের প্রোটিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

CamScanner

৩.৮.৭ খাদ্য তালিকায় প্রোটিন (Protein in Diet)

প্রোটিন শরীর গঠনের মুখ্য উপাদান, তাই এটি খাদ্য তালিকায় রাখা অপরিহার্য। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে ডাল জাতীয় খাবারেই বেশি প্রোটিন পাওয়া যায়, তবে প্রাণিজ প্রোটিনকেই পুষ্টি বিজ্ঞানীরা অধিক প্রাধান্য দেয়। প্রোটিনে ২০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। মানবদেহের চাহিদা পূরণের জন্য ৯ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড (লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, মেথিওনিন, থ্রিওনিন, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন, হিস্টিডিন এবং ট্রিপটোফ্যান) কে **অত্যাবশ্যকীয়** অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়। এর কারণ হলো অন্য ১১টি অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে কিন্তু উক্ত ৯টি অ্যামিনো অ্যাসিড দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না, খাদ্যের মাধ্যমে তা গ্রহণ করা হয়। শিশুদের জন্য আরজিনিন এবং হিস্টিডিন অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড হলো ১০টি।

যে সব প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে খাদ্য তালিকায় সেগুলোকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এদিক থেকে প্রাণিজ প্রোটিনই (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি) অগ্রগামী (উৎকৃষ্ট) এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (যেমন— ডাল) অনুগামী।

প্রকৃতপক্ষে প্রোটিনের মান বিচারে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের উপস্থিতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। অত্যাবশ্যকীয় ৯টি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটিও যদি ন্যূনতম আদর্শ পরিমাণের চেয়ে কম থাকে তা হলেই এর মান কমে যায়। কারণ দেহ সঠিক পরিমাণে তা শোষণ করতে পারে না। মানের দিক থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পিছনে থাকার এটিই কারণ। আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার। চালের প্রোটিন এবং ডালের প্রোটিন এক সাথে হলে একটির অভাব অপরটি কিছুটা পূরণ করে। তাই চাল-ডালের খিচুড়ির পুষ্টিমান ভাত এবং ডালের চেয়ে উপরে।

আদর্শ প্রোটিন: প্রতি ১০০ গ্রাম আদর্শ প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ (গ্রাম)

	আইসোলিউসিন	লিউসিন	লাইসিন	ফিনাইল অ্যালানিন	মেথিওনিন	থ্রিওনিন	ট্রিপ্টোফ্যান	ভ্যালিন
আদর্শ প্রোটিন	৪.৩	৪.৯	৪.৩	২.৯	২.৩	২.৯	১.৪	৪.৩
ডিম	৬.৮	৯.০	৬.৩	৬.০	৩.১	৫.০	১.৭	৭.৪
গরুর দুধ	৬.৪	৯.৯	৭.৮	৪.৯	২.৪	৪.৬	১.৪	৬.৯
মসুর ডাল	৫.২	৬.৯	৬.১	৪.১	০.৬	৩.৬	০.৮	৫.৫
মাছ	৬.৫	৯.৫	৯.০	৪.৪	৩.২	৪.৭	১.২	৬.০
মাংস	৫.২	৭.৮	৮.৬	৩.৯	২.৭	৪.৪	১.০	৫.১

বি. দ্র.: ডিম এবং দুধ আদর্শ প্রোটিন। মাছ-মাংসে ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। ডালে মেথিওনিন ও ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। কাজেই মাছ-মাংস প্রকৃত আদর্শ প্রোটিন নয়। ডালের প্রোটিন আরো নিম্নমানের।

বাড়ির কাজ

A একটি পলিপেপটাইড যৌগ যা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে তৈরি হয়। এটি জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. *A কীভাবে গঠিত হয় ব্যাখ্যা করো।*

খ. *এটি জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।*

CamScanner

পাঠ ৬

লিপিড বা স্নেহ পদার্থ
Lipids

৩.৯ লিপিড বা স্নেহ পদার্থ (Lipids)

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিনের মতো লিপিডও জীবদেহের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান। লিপিড এমন এক জৈব পদার্থ যা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত এবং পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন, ইথার প্রভৃতি জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। **রাসায়নিকভাবে অ্যালকোহল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে লিপিড বলে।** লিপিড বিভিন্ন প্রকার হওয়াতে এদের গলনাঙ্কও বিভিন্ন। যেসব সরল লিপিড কক্ষ তাপমাত্রায় (২০°সে.) কঠিন অবস্থায় থাকে তাদের **চর্বি বা ফ্যাট (Fats)** বলে। আর যারা তরল অবস্থায় থাকে তাদেরকে **তেল বা ওয়েল (Oils)** বলে।

৩.৯.১ লিপিডের উৎস (Sources of Lipids)

প্রাণিজ চর্বি, ঘি, মাখন, দুধ লিপিডের প্রাণিজ উৎস। অপরদিকে উদ্ভিদজগতে সরিষা, তিল, সয়াবিন, নারিকেল, বাদাম, সূর্যমুখী, জলপাই, ওয়েলপাম প্রভৃতির বীজে উদ্ভিজ্জ লিপিড সঞ্চিত থাকে। আকন্দ, রোডোডেনড্রন-এর পাতার ওপর, ভেড়ার লোম, হাঙ্গর, তিমির দেহে, মৌচাকে প্রচুর লিপিড থাকে।

৩.৯.২ লিপিডের গঠন (Structure of Lipids)

লিপিড ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার। লিপিড সাধারণত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত। একে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল পাওয়া যায়। অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে ফসফোলিপিডে ফসফরিক অ্যাসিড, গ্লাইকোলিপিডে গ্লুকোজ বা গ্যালাকটোজ, লিপোপ্রোটিনের ক্ষেত্রে প্রোটিন এবং সালফোলিপিডে সালফার থাকে।

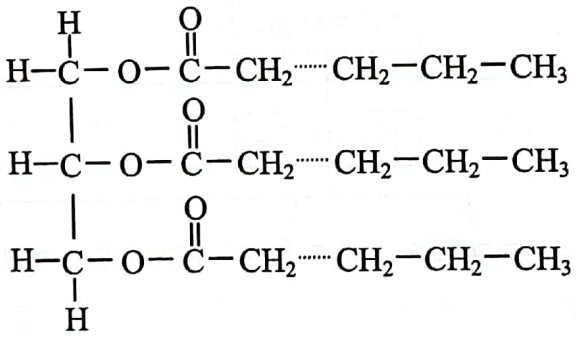

চিত্র-৩.১৯ : ট্রাইগ্লিসারাইড

৩.৯.৩ লিপিডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Lipids)

১. লিপিড বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন।
২. এরা পানিতে অদ্রবণীয়।
৩. লিপিড ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে থাকে।
৪. আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে এরা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়।
৫. পানির চেয়ে হালকা তাই পানিতে ভাসে।
৬. এদের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।
৭. এদের নির্দিষ্ট কোনো গলনাঙ্ক নেই।
৮. Sudan III দ্রবণ লিপিডের সাথে যোগ করলে তা লাল বর্ণ ধারণ করে।

CamScanner

৯. কক্ষ তাপমাত্রায় (২০°সে.) কিছু লিপিড (যেমন– তেল) তরল এবং কিছু লিপিড (যেমন– চর্বি) কঠিন অবস্থায় থাকে।

১০. বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে, যেমন– ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদিতে দ্রবণীয়।

৩.৯.৪ লিপিডের কাজ (Function of Lipids)

১. বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে থাকে।

২. গ্লাইকোলিপিড সালোকসংশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩. এরা প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন সকল প্রকার শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

৪. পাতার বহিরাবরণে মোম জাতীয় লিপিড স্তর (কিউটিকল) সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।

৫. ফসফোলিপিড কতিপয় এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া আয়নের বাহক হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে।

৬. উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে প্রধানত চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের (সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।

৭. গ্লাইকোলিপিড মানুষের রক্ত গ্রুপিং সৃষ্টি করে।

৩.৯.৫ লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Lipids)

রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে লিপিড তিন প্রকার (Bloor, 1943)। যথা— ১. সরল লিপিড, ২. যৌগিক লিপিড এবং ৩. উদ্ভূত লিপিড। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো–

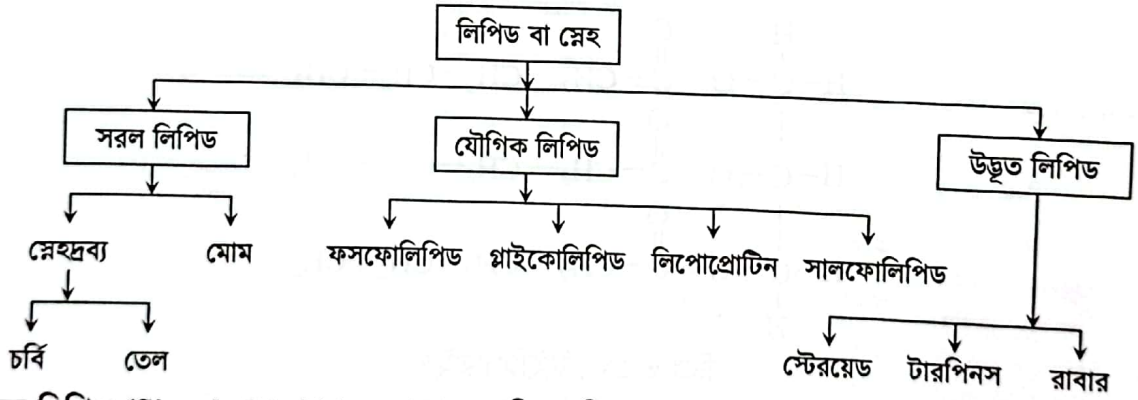

I. সরল লিপিড (Simple Lipids): এরা শুধু ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যালকোহল নিয়ে গঠিত তাই এদের সরল লিপিড বলে। অর্থাৎ যে সকল লিপিডকে বিশ্লেষণ করলে স্নেহ পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না তাদের সরল লিপিড বলে। সরল লিপিড দু'প্রকার। যথা– (i) স্নেহ দ্রব্য ও (ii) মোম।

i. **স্নেহ দ্রব্য বা ট্রাইগ্লিসারাইড:** তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড ও এক অণু গ্লিসারলের সমন্বয়ে যে লিপিড গঠিত হয় তাদের ট্রাইগ্লিসারাইড বা স্নেহ দ্রব্য বলে। এ ধরনের লিপিড অ্যাসিড এবং ক্ষার দ্রবণে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় বলে এদের নিউট্রাল লিপিডও বলে। ট্রাইগ্লিসারাইড দু'প্রকার। যথা– চর্বি ও তেল।

চর্বি (Fats): সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড সাধারণ তাপমাত্রায় (২০°সে.) কঠিন অবস্থায় থাকে তাদের চর্বি বলে। যেমন- প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ চর্বি, ঘি, মাখন, নারিকেল তেল, পামওয়েল। চর্বির গলনাঙ্ক বেশি, প্রায় ৭০° সে. এর কাছাকাছি। যেমন- পামিটিক অ্যাসিডের গলনাঙ্ক ৬৩°সে.।

CamScanner

তেল (Oils): অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) তরল অবস্থায় থাকে তাদের তেল বলে। যেমন- সাধারণ ভোজ্যতেল, অলিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড, লিনোলেনিক অ্যাসিড। এদের গলনাঙ্ক খুব কম, যেমন- লিনোলিক অ্যাসিডের গলনাঙ্ক –৫° সে.।

চর্বি ও তেলের কাজ

১. উদ্ভিদের ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্যরূপে জমা থাকে।
২. বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় এসব লিপিড কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তরিত হয়ে বর্ধিষ্ণু চারার জন্যে খাদ্য ও শক্তি যোগান দেয়।

ii. **মোম (Wax):** গ্লিসারল ছাড়া অ্যালকোহল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে **মোম** বলে। অধিকাংশ মোম বিভিন্ন প্রকার এস্টারের মিশ্রণ। সাধারণ উষ্ণতায় এরা কঠিন, পানিতে অদ্রবণীয় এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এদের চেইন অত্যন্ত দীর্ঘ। ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিসর C_{14} হতে C_{36}। আর অ্যালকোহলের পরিসর C_{16} হতে C_{36}।

কাজ

১. মোম সাধারণত কচি পাতা, কাণ্ড, বোঁটা, ফলের ত্বকের উপর পাতলা স্তর আকারে অবস্থান করে এবং পানিতে পচন রোধ করে।
২. উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের কিউটিন ও সুবেরিন মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি, যা কোষের সঠিক গঠনে ভূমিকা রাখে।
৩. পাতা ও কাণ্ডের উপর সৃষ্ট মোম জাতীয় কিউটিকল প্রস্বেদনের হার হ্রাস করে।
৪. মোম বিভিন্ন প্রসাধন শিল্পে ব্যবহার করা হয়।
৫. মোমবাতি তৈরিতে মোম ব্যবহৃত হয়।

II. যৌগিক লিপিড (Compound Lipids): সরল লিপিডের সাথে যদি কিছু জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে তবে তাকে **যৌগিক লিপিড** বলে। সেজন্য যৌগিক লিপিডে ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যালকোহল ছাড়াও বিভিন্ন মূলক থাকে। যৌগিক লিপিড চার প্রকার। যথা– **ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড, সালফোলিপিড** এবং **লিপোপ্রোটিন**।

ফসফোলিপিড (Phospholipid): গ্লিসারল, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফসফেটের সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে **ফসফোলিপিড** বলে। এতে বিশেষ উপাদান হিসেবে ফসফোটাইডিক অ্যাসিড থাকে। লেসিথিন, সেফালিন, প্লাজমালোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিডের ফসফেট গ্রুপ যদি কোলিন দ্বারা এস্টারীভূত হয়, তবে তাকে **লেসিথিন** এবং হাইড্রোক্সিল দ্বারা সেরিন এস্টারীভূত হলে তাকে **সেফালিন** বলে। ফসফোলিপিড কোষপর্দা, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, নিউক্লিওপর্দা গঠনে অংশ নেয়।

কাজ

১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় অঙ্গাণুর পর্দার গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
২. আবরণীর মতো কাজ করার জন্য দু'পাশে বিভিন্ন পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. কিছু এনজাইমে প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে।
৪. ফসফোলিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
৫. ফ্যাটি অ্যাসিড জারণের হার বৃদ্ধি করে।
৬. আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে।
৭. কোষের ভেদ্যতা ও পরিবহন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
৮. এটি কোষের অভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থা (homeostasis) বজায় রাখে।

গ্লাইকোলিপিড (Glycolipid): সরল লিপিড এর সাথে যদি কার্বোহাইড্রেট সংযুক্ত থাকে তবে তাকে গ্লাইকোলিপিড বলে। এখানে কার্বোহাইড্রেট হিসেবে গ্লুকোজ অথবা গ্যালাকটোজ থাকে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণকারী অঙ্গে (ক্লোরোপ্লাস্টের পর্দায়) ফসফোলিপিড অপেক্ষা গ্লাইকোলিপিড বেশি থাকে। তুলা ও সূর্যমুখীর বীজে গ্লাইকোলিপিড পাওয়া যায়। গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে **গ্লাইকোক্যালিক্স** বলে।

CamScanner

কাজ

১. কোষের আন্তঃক্রিয়ায় শনাক্তকরণ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. মানুষের রক্তে গ্রুপিং সৃষ্টি করে।

৩. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. সালোকসংশ্লেষণকারী অঙ্গাণু গঠনে সহায়তা করে।

সালফোলিপিড (Sulpholipid): যে গ্লাইকোলিপিডে সালফার থাকে তাকে সালফোলিপিড বলে। শুধু ক্লোরোপ্লাস্টে এ যৌগটি প্রচুর পাওয়া যায়।

লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein): লিপিডের সাথে প্রোটিন যুক্ত হয়ে যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে লিপোপ্রোটিন বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের লিপিড অংশ কোলেস্টেরল, এস্টার এবং ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত। লিপোপ্রোটিন কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট আবরণীতে দেখতে পাওয়া যায়।

কাজ: ১. লিপোপ্রোটিন কোষ অঙ্গাণুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২. শ্বসনের ক্ষেত্রে মাইটোকন্ড্রিয়ায় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের (ETS) সাথে যুক্ত থেকে শক্তি উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

III. উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড (Derived Lipids): যৌগিক লিপিডের আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে যে লিপিড উদ্ভূত হয় তাকে উদ্ভূত লিপিড বলে।

উদ্ভূত লিপিড বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন– i. স্টেরয়েড, ii. টারপিনস, iii. রাবার ইত্যাদি। নিচে সংক্ষেপে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো–

i. স্টেরয়েডস (Steroids): সাধারণত ২৭ থেকে ২৯ কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড যৌগগুলোকে স্টেরয়েড বলা হয়। আবার যেসব স্টেরয়েডে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে তাদের **স্টেরল** (sterol) নামে অভিহিত করা হয়। ব্যাকটেরিয়া এবং সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার উদ্ভিদে স্টেরল উপস্থিত। এরা উদ্ভিদের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় অথবা গ্লাইকোসাইড হিসেবে থাকে। কোলেস্টেরল, স্টিগমাস্টেরল, আর্গোস্টেরল, বেটা– সাইটোস্টেরল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েড।

কোলেস্টেরল: কোষের প্লাজমামেমব্রেনের একটি গরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কোলেস্টেরল। এটি সাধারণ একটি স্টেরল। কোলেস্টেরল একটি জটিল মনোহাইড্রিক গৌণ অ্যালকোহল যৌগ। ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে কোলেস্টেরল বিক্রিয়া করে মোম গঠন করে। প্রাণিদেহের তুলনায় উদ্ভিদদেহে কোলেস্টেরলের উপস্থিতি এবং মাত্রা কম। তবে চুপরি আলুতে (*Dioscorea* sp) সর্বোচ্চ পরিমাণে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। এছাড়া আলু, ওলকচু, মুখীকচু প্রভৃতি সঞ্চয়ী ভূ-নিম্নস্থ অঙ্গে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। কোলেস্টেরল দু'প্রকার। যথা—

ক. **লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (LDL):** মানুষের রক্তে LDL এর মাত্রা কম (<100 mg/dl) থাকা ভালো।

খ. **হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (HDL):** মানুষের রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (40 < mg/dl) থাকা ভালো। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তে HDL বেশি থাকে। তাই মহিলাদের হৃদরোগ অপেক্ষাকৃত কম হয়।

মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ০.১৫– ১.২০%। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে তা রক্তনালির গাত্রে জমা হয়ে রক্তনালির পথকে সরু করে দেয়। ফলে শরীরে রক্তচাপ বাড়ে এবং রক্ত সরবরাহ কমে যায়। এর ফলে **করোনারি থ্রম্বোসিস** নামক হৃদরোগ হয়।

CamScanner

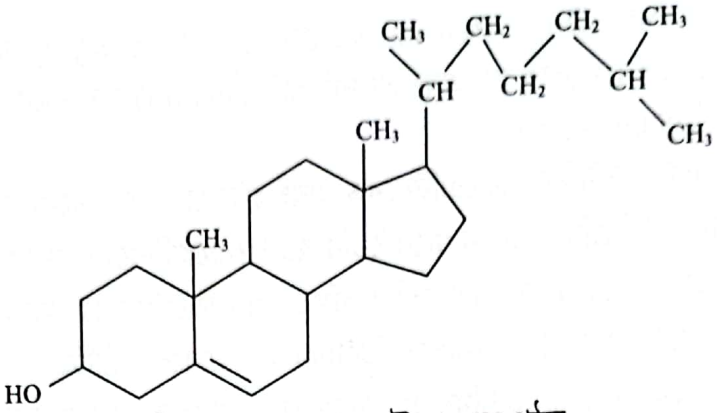

চিত্র-৩.২০: কোলেস্টেরল এর গঠন

কাজ:

১. কিছু স্টেরয়েড হরমোন প্রাণীর যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।
২. প্রোটিন ও চর্বি হজম, পানির ভারসাম্য রক্ষা, কোষপর্দা গঠন প্রভৃতি কাজ বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েড করে থাকে।
৩. স্টেরয়েড অনেক সময় কোষে সংকেত প্রদানকারী অণু হিসেবে কাজ করে।
৪. কোষ আবরণীর তারল্যতা হ্রাসে কোলেস্টেরল বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ii. **টারপিনস (Terpenes):** ১০ থেকে ৪০ কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড (C_5H_5) যৌগগুলোকে টারপিনস বলে। টারপিনস এক ধরনের উদ্ভূত লিপিড। এর সাধারণ সংকেত $(C_5H_8)_n$। এগুলো মূলত উদ্বায়ী তেল যা তুলসি, পুদিনা, পাইনাসের পাতার বিশেষ কোষে উৎপন্ন হয়। পিনিন, কর্পূর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার টারপিনস।

ব্যবহার: সুগন্ধি তৈরিতে এবং বার্নিশের কাজে টারপিনস এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

iii. **রাবার (Rubber):** রাবার এক প্রকার পলিটারপিন। রাসায়নিকভাবে ৩০০০ থেকে ৬০০০ আইসোপ্রিন এককের (C_5H_8) সমন্বয়ে একটা রাবারের অণু গঠিত। এর আণবিক ওজন প্রায় ৩ লাখ ডাল্টন। এদের বিভিন্ন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদের ল্যাটেক্সে পাওয়া যায়।

প্যারা রাবার (*Hevea brasiliensis*), ভারতীয় রাবার (*Ficus elastica*) প্রভৃতি উদ্ভিদে রাবার পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় ৮০% শিল্পের সাথে রাবার জড়িত। সংক্ষিপ্তভাবে বললে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন, তথ্য ও যোগাযোগ শিল্পে রাবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাবারের ব্যবহার:

১. সকল প্রকার যানবাহনের টায়ার ও টিউব তৈরিতে রাবার ব্যবহৃত হয়।
২. বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী তৈরিতে রাবারের ব্যবহার রয়েছে।
৩. গ্ল্যাভস, আঠা, ইরেজার, রাবার ব্যান্ড, ইনসুলেটর ইত্যাদি তৈরিতে রাবার ব্যবহৃত হয়।
৪. গার্মেন্টস শিল্পে রাবারের ব্যবহার রয়েছে।

লিপিড-এর রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition of Lipids)

সাধারণত লিপিড কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত এবং এতে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল ছাড়া ফসফরাস ও নাইট্রোজেন ক্ষারকও থাকতে পারে। মোমে সাধারণত গ্লিসারল থাকে না, এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে। গ্লাইকোলিপিডে ফ্যাটি অ্যাসিড, হেক্সোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ বিদ্যমান।

ভিন্নধর্মী লিপিড

কিছু লিপিডের রাসায়নিক গঠন ট্রাইগ্লিসারাইডস ও ফসফোলিপিড থেকে ভিন্নতর। এদের ভিন্নধর্মী লিপিড বলে। যেমন– ক্যারোটিনয়েড এবং ভিটামিনসমূহ। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

ক্যারোটিনয়েডস (Carotenoids): এদেরকে আলোক শোষণকারী পিগমেন্ট বলা হয়। পাতায় বিটা-ক্যারোটিন আলোকশক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে। এছাড়া বিটা-ক্যারোটিন আলোক অনুধাবন

CamScanner

করে ফটোট্রপিজম ঘটায়। বিটা-ক্যারোটিন মানবদেহের অভ্যন্তরে ভেঙ্গে দুই অণু ভিটামিন-A তৈরি করে যা থেকে পরবর্তীকালে **রডোপসিন** (rhodopsin) তৈরি হয় এবং তা দৃষ্টিশক্তি (vision) দান করে। বিটা-ক্যারোটিন পাওয়া যায় ডিমের, কুসুম, গাজর, টমেটো ইত্যাদি থেকে।

ভিটামিনসমূহ (Vitamins): কিছু ভিটামিন ক্যারোটিনয়েড এবং স্টেরয়েড-এর মতো **আইসোপ্রিন** (isoprene)-এর রাসায়নিক পরিবর্তন ও **কোভ্যালেন্ট লিংকিং**-এর মাধ্যমে তৈরি হয়। ক্যারোটিনয়েড থেকে ভিটামিন-A তৈরি হয়। এর অভাব হলে ত্বক শুষ্ক হয়, রাতকানা রোগ হয় এবং বৃদ্ধি রহিত হয়। ভিটামিন-D ক্যালসিয়াম শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে হাড়জনিত বিভিন্ন রোগ হয়। কিছু লিপিড ভিটামিন-E হিসেবে পরিচিত। এরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে। ভিটামিন-K সবুজ শাকসবজিতে পাওয়া যায় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াও অনেক সময় ভিটামিন-K তৈরি করে। এরা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো B ও C এবং পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো A, D, E এবং K।

৩.৯.৬ জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা (Role of Lipids in Living Body)

জীবদেহে বিভিন্নভাবে লিপিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিচে জীবদেহে লিপিডের ভূমিকাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

১. **কোষ ঝিল্লি গঠন:** কোষ ঝিল্লিসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণুর ঝিল্লি গঠনে লিপিড মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ফসফোলিপিড কোষঝিল্লির অন্যতম গাঠনিক উপাদান।

২. **সঞ্চিত খাদ্য:** সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে লিপিড জীবদেহে জমা থাকে এবং প্রয়োজনে তা জীবদেহে শক্তি সরবরাহ করে।

৩. **সালোকসংশ্লেষণ:** গ্লাইকোলিপিড সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. **প্রতিরোধক স্তর:** মোমজাতীয় লিপিড পাতা, বোঁটা এমনকি ফলের উপরিতলে আবরণ তৈরির মাধ্যমে পানি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি এ স্তরটি ছত্রাক প্রতিরোধক স্তর হিসেবেও কাজ করে।

৫. **আয়ন বাহক:** ফসফোলিপিড কোষের আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে।

৬. **শোষণ ও পরিবহন:** ফসফোলিপিড স্তন্যপায়ীদের অন্ত্র থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড শোষণ করে যকৃতে পরিবহন করে।

৭. **প্রোস্থেটিক গ্রুপ:** জীবদেহের কতিপয় এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে এবং জৈবিক ক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।

৮. **প্রস্বেদনের হার হ্রাস:** উদ্ভিদের কচি কাণ্ডে এবং পাতার কিউটিকলে মোমজাতীয় লিপিড জমা হয়ে প্রস্বেদনের হারকে কমিয়ে দেয়।

৯. **সুগন্ধি তৈরি:** টারপিন জাতীয় লিপিড উদ্ভিদে সুগন্ধি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

১০. **রক্ত জমাট বাঁধা:** রক্ত জমাট বাঁধার শুরুতে লিপিড অণুচক্রিকার ফসফোটাইড থ্রম্বোপ্লাস্টিন-এর কার্যকারিতাকে ত্বরান্বিত করে।

১১. **বর্ণ সৃষ্টি:** ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, ক্লোরোফিল ইত্যাদি লিপিড উদ্ভিদে বর্ণ সৃষ্টি করে।

১২. **হরমোন সংশ্লেষণ:** কোলেস্টেরল জাতীয় লিপিড থেকে সেক্স হরমোন সংশ্লেষিত হয়।

১৩. **তাপ নিরোধক:** জলচর এবং শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণীদের ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি তাপ নিরোধক হিসেবে কাজ করে।

শ্রেণির কাজ

লিপিডের বিভিন্ন উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

CamScanner

পাঠ ৭

এনজাইম বা উৎসেচক
Enzyme

৩.১০ এনজাইম বা উৎসেচক (Enzyme)

প্রতিটি জীবন্ত জীবকোষে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি নানা প্রকার জৈবনিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে অর্থাৎ জীবন এক প্রকার গতিশীল প্রাণরাসায়নিক অবস্থা। এনজাইমসমূহ জৈব বস্তু এবং এরা মূলত বিশেষ ধরনের প্রোটিন, যা প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। **জীবদেহে (অণুজীব, উদ্ভিদ, প্রাণী) বিদ্যমান স্বল্পমাত্রিক প্রোটিনধর্মী পদার্থ যা সকল প্রকার জৈবিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে নিজেরা মুক্ত হয় এবং অপরিবর্তিত থাকে, তাদের এনজাইম বলে।**

যে জৈব বস্তুর উপর এনজাইম ক্রিয়া করে, তাকে **সাবস্ট্রেট** (substrate) বলে এবং যা উৎপন্ন করে, তাকে **প্রোডাক্ট** (product) বলে। এনজাইমের প্রধান কাজ জীবদেহের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে জীবদেহ সচল রাখা। জীবদেহে শক্তি সঞ্চয় এবং শক্তি নির্গমনে এনজাইমের ভূমিকা রয়েছে।

১৮৭৮ সালে **কুন** (F.H. Kuhne) সর্বপ্রথম **Enzyme** শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে ১৮৯৭ সালে **বুচনার** (Eduard Buchner) চিনির গাঁজনের জন্য দায়ী পদার্থকে এনজাইম হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরপর **জেমস্ সামনার** (James B. Sumner) ১৯২৬ সালে প্রথম **ইউরিয়েজ** নামক এনজাইম কোষ থেকে পৃথক করেন এবং বলেন, **'Enzymes are proteins'**।

৩.১০.১ এনজাইমের ভৌত বৈশিষ্ট্য/ধর্ম (Physical Characteristics of Enzyme)

১. এনজাইম প্রোটিন দ্বারা তৈরি।
২. এটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে।
৩. জীবকোষে এনজাইম কলয়েড (colloid) রূপে অবস্থান করে।
৪. সক্রিয় হওয়ার পূর্বে এদের পানি প্রয়োজন হয়।
৫. একমাত্র জীবিত কোষেই এরা তৈরি হয়।
৬. এনজাইম খুব অল্প মাত্রায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।
৭. pH দ্বারা এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত হয়। সকল এনজাইম pH 6-9 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল।
৮. এনজাইম তাপ সংবেদনশীল। সাধারণত ৩৫° সে - ৪০° সে তাপমাত্রায় এনজাইম অধিক ক্রিয়াশীল।
৯. প্রতিটি এনজাইম একটি নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়া করে এবং তাদের নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটায়।
১০. প্রায় সব এনজাইমই পানিতে দ্রবণীয়।
১১. অধিক তাপমাত্রায় এবং প্রখর আলোয় এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।
১২. এনজাইমের কার্যকারিতা এদের ত্রিমাত্রিক গঠন দ্বারা নির্ধারিত।
১৩. এদের অণুগুলো বৃহদাকার এবং অধিক আণবিক ওজন বিশিষ্ট।
১৪. এনজাইমের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ উভমুখী ধরণের।

৩.১০.২ এনজাইমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য (Chemical Characteristics of Enzyme)

১. সকল এনজাইম প্রোটিনধর্মী, তাই প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডই এনজাইমের মূল রাসায়নিক গঠন উপাদান।
২. এনজাইম মূলত প্রোটিন হওয়ায় এরা কলয়েডধর্মী।
৩. প্রতিটি সুনির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিড সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট।
৪. এনজাইম অম্লীয় এবং ক্ষারীয় উভয় পরিবেশেই ক্রিয়াশীল।
৫. কিছু সংখ্যক স্নেহ বিশ্লেষণকারী এনজাইম ছাড়া সব এনজাইমই পানি, অ্যালকোহল ও গ্লিসারলে দ্রবণীয়।

CamScanner

৬. অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পিকরিক অ্যাসিড ইত্যাদি দ্বারা এনজাইম অধঃক্ষেপিত হয়।
৭. কো-এনজাইম, কো-ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এনজাইমের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।
৮. উচ্চ তাপমাত্রা (50 – 100°C), অতিবেগুনি রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

৩.১০.৩ এনজাইমের নামকরণ (Enzyme Nomenclature)

এনজাইমের নামকরণ তিনটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। যথা– ১. সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে, ২. বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে এবং ৩. সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

১. **সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে:** যে সব পদার্থের ওপর এনজাইম ক্রিয়া করে তাকে বলা হয় সাবস্ট্রেট। যে সাবস্ট্রেটের ওপর এনজাইম ক্রিয়া করে তার নামের শেষে 'এজ' (ase) যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যেমন–

সাবস্ট্রেট		এনজাইম
i. লিপিড + এজ	=	লাইপেজ
ii. প্রোটিন + এজ	=	প্রোটিয়েজ
iii. সুক্রোজ + এজ	=	সুক্রেজ
iv. ইউরিয়া + এজ	=	ইউরিয়েজ
v. আরজিনিন + এজ	=	আরজিনেজ
vi. টাইরোসিন + এজ	=	টাইরোসিনেজ

জেনে রাখো

- লিপিড বা চর্বিকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে রূপান্তরিত করে লাইপেজ।
- স্টার্চকে মল্টোজে রূপান্তরিত করে অ্যামাইলেজ।
- ট্রান্সকিটোলোজ এনজাইম ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেটকে জাইলুলোজ ৫-ফসফেটে রূপান্তরিত করে।

২. **বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে:** এনজাইম যে ধরনের বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে সেই বিক্রিয়ার নামের প্রথমাংশের সাথে 'এজ' যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যেমন–

বিক্রিয়া		এনজাইম
অক্সিডেশন + এজ	=	অক্সিডেজ
রিডাকশন + এজ	=	রিডাকটেজ
হাইড্রোলাইসিস + এজ	=	হাইড্রোলেজ

৩. **সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে:** কোনো কোনো এনজাইমের নাম দুটি অংশের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। এর প্রথম অংশটি সাবস্ট্রেটের নামানুসারে এবং দ্বিতীয় অংশটি বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন– হেক্সোকাইনেজ, পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ ইত্যাদি।

৩.১০.৪ এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Enzyme)

ক. রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে এনজাইম দু'প্রকার। যথা— i. **সরল এনজাইম** এবং ii. **সংযুক্ত এনজাইম**।

i. **সরল এনজাইম (Simple Enzyme):** যে এনজাইম শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাদের সরল এনজাইম বলে। যথা— প্রোটিয়েজ, অ্যামাইলেজ, সুক্রেজ, অক্সিডেজ প্রভৃতি।

ii. **সংযুক্ত বা যৌগিক এনজাইম (Conjugated Enzyme):** যে এনজাইম একটি প্রোটিন এবং একটি নন-প্রোটিন অংশ নিয়ে গঠিত তাদের সংযুক্ত বা যৌগিক এনজাইম বলে। সংযুক্ত এনজাইমের প্রোটিন অংশকে **অ্যাপো-এনজাইম** আর নন-প্রোটিন অংশকে **প্রোস্থেটিক গ্রুপ** বলে। **প্রোস্থেটিক গ্রুপটি** কোনো জৈব পদার্থ অথবা ধাতব অণু হতে পারে। যেমন- FAD, NAD।

খ. রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।

i. **অক্সিডোরিডাকটেজ (Oxidoreductase):** এসব এনজাইম সাবস্ট্রেটকে জারিত অথবা বিজারিত করে। এজন্য এরা ইলেকট্রন (e^-) এবং প্রোটন (H^+) স্থানান্তরের সাথে জড়িত। যেমন- ডিহাইড্রোজিনেজ, অক্সিডেজ, রিডাকটেজ ইত্যাদি।

সাকসিনিক অ্যাসিড + FAD $\xrightleftharpoons{\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}}$ ফিউমারিক অ্যাসিড + $FADH_2$

CamScanner

ii. **ট্রান্সফারেজ (Transferase):** এমন এনজাইমগুলো কোনো সাবস্ট্রেট হতে একটি গ্রুপকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য একটি সাবস্ট্রেটের সাথে সংযুক্ত করে। যেমন- কাইনেজ, ট্রান্সঅ্যামাইলেজ ইত্যাদি।

রাইবুলোজ ৫-ফসফেট + ATP $\xrightleftharpoons{\text{কাইনেজ}}$ রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট + ADP

iii. **হাইড্রোলেজ (Hydrolase):** এ ধরনের এনজাইম সাবস্ট্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ, পানির আয়নকে (H^+) সাবস্ট্রেট এর বিশেষ বন্ধনীর সাথে যুক্ত করে এবং সাবস্ট্রেটকে ভেঙে ফেলে। যেমন- সুক্রেজ, ফসফেটেজ, এস্টারেজ ইত্যাদি।

সুক্রোজ + পানি $\xrightleftharpoons{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

iv. **লাইয়েজ (Lyase):** এসব এনজাইম জারণ-বিজারণ এবং আর্দ্রবিশ্লেষণ ছাড়াই সাবস্ট্রেটের কোনো মূলককে স্থানান্তরিত করে। যেমন– অ্যালডোলেজ, সাইট্রিক সিন্থেটেজ, ফিউমারেজ ইত্যাদি।

ফ্রুক্টোজ ১,৬-বিসফসফেট $\xrightleftharpoons{\text{অ্যালডোলেজ}}$ ৩-ফসফোগ্লিসারাল্ডিহাইড + ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট

v. **আইসোমারেজ (Isomerase):** এসব এনজাইম জৈব পদার্থগুলোকে (সাবস্ট্রেট) আইসোমার গঠনে সাহায্য করে। যেমন– ফসফোগ্লুকো আইসোমারেজ, মিউটেজ।

গ্লুকোজ ৬-ফসফেট $\xrightleftharpoons{\text{ফসফোগ্লুকোআইসোমারেজ}}$ ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট

vi. **এপিমারেজ (Epimerase):** এ জাতীয় এনজাইমসমূহ কোনো সাবস্ট্রেটকে তার এপিমারে পরিণত করে। যেমন– এপিমারেজ।

জাইলুলোজ ৫-ফসফেট $\xrightleftharpoons{\text{এপিমারেজ}}$ রাইবুলোজ ৫-ফসফেট

vii. **লাইগেজ (Ligase):** এ জাতীয় এনজাইম ATP-র সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে যুক্ত করে নতুন যৌগ তৈরি করে। যেমন– গ্লুটামিক সিন্থেটেজ, অ্যাসিটাইল কো-এ সিন্থেটেজ।

গ্লুটামিক অ্যাসিড + NH_3 + ATP $\xrightleftharpoons{\text{গ্লুটামিক সিন্থেটেজ}}$ গ্লুটামিন + ADP + Pi

viii. **কার্বোক্সিলেজ (Carboxylase):** এসব এনজাইম সাবস্ট্রেট হতে CO_2 অণুকে পৃথক করে অথবা অন্য কোনো পদার্থের সাথে CO_2 কে সংযুক্ত করে। যেমন—

অক্সালো সাকসিনিক অ্যাসিড $\xrightleftharpoons{\text{কার্বোক্সিলেজ}}$ α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড + CO_2

ix. **ফসফোরাইলেজ (Phosphorylase):** এসব এনজাইম কোনো সাবস্ট্রেট থেকে ফসফেট গ্রুপকে পৃথক করে অথবা কোনো পদার্থের সাথে ফসফেট গ্রুপকে সংযুক্ত করে। যেমন– ফসফোরাইলেজ।

ফ্রুক্টোজ ১,৬-বিসফসফেট $\xrightleftharpoons{\text{ফসফোরাইলেজ}}$ ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট + Pi

৩.১০.৫ প্রোস্থেটিক গ্রুপ (Prosthetic Group)

সংযুক্ত এনজাইমের ক্ষেত্রে প্রোটিনযুক্ত অংশের সাথে যে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তাকে **প্রোস্থেটিক গ্রুপ** বলে। এনজাইমের প্রোস্থেটিক অংশটি অপসারণ করলে এনজাইমের কর্মক্ষমতা লোপ পায়। বিভিন্ন এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপ এক হলেও তাদের প্রোটিন অংশ আলাদা হওয়ায় কার্যকারিতা ভিন্ন হয়। প্রোস্থেটিক গ্রুপ দু'প্রকার। যথা–
i. কো-এনজাইম ও ii. কো-ফ্যাক্টর।

i. **কো-এনজাইম (Co-enzyme):** এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপটি কোন জৈব যৌগ হলে তাকে **কো-এনজাইম** বলে। যেমন- ATP, FMN, NADP, FAD, NAD প্রভৃতি।

এনজাইমের ক্রিয়াকালে কো-এনজাইম সাধারণত সাবস্ট্রেট হতে যে এটম বিয়োজন হয় তার গ্রহীতা (acceptor) হিসেবে বা সাবস্ট্রেট-এর সাথে যে এটম যোগ হয় তার দাতা (donor) হিসেবে কাজ করে। এনজাইম হতে কো-এনজাইম অংশ পৃথক করে নিলে এনজাইমের কার্যক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম হলো–

- FAD = Flavin Adenine Dinucleotide
  $FADH_2$ = Reduced Flavin Adenine Dinucleotide
- FMN = Flavin Mononucleotide (ভিটামিন B_2-মনোফসফেট)
- NAD = Nicotinamide Adenine Dinucleotide

CamScanner

$NADH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide
- NADP = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
  $NADPH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
- CoA = Co-enzyme A
- ATP = Adenosine Triphosphate

ii. **কো-ফ্যাক্টর (Co-factor):** এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপটি কোন ধাতুর আয়ন হলে তাকে **কো-ফ্যাক্টর** বলে। যেমন- Mg^{++}, Fe^{++}, Mn^{++}, Zn^{++} প্রভৃতি।

একক কাজ

এনজাইম ও কো-এনজাইমের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য ছকে লিপিবদ্ধ করো।

পাঠ ৮

এনজাইমের কাজের কৌশল
Mechanism of Enzyme Action

৩.১১ এনজাইমের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত মতবাদ (Theories Related to the Mechanism of Enzyme Action)

কোনো একটি এনজাইম যে জৈব বস্তুর উপর ক্রিয়া করে সেই জৈব বস্তুকে ঐ এনজাইমের **সাবস্ট্রেট** বলে। সাবস্ট্রেটের উপর এনজাইমের ক্রিয়া দু'টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা–

- **প্রথম পর্যায়:** প্রতিটি এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান (active site) থাকে। সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের এ সক্রিয় স্থানে সংযুক্ত হয়ে **এনজাইম-সাবস্ট্রেট** যৌগ গঠন করে।
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙ্গে গিয়ে এনজাইম অপরিবর্তিত অবস্থায় পৃথক হয়ে যায়। আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সাবস্ট্রেট থেকে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়।

এনজাইমের উপস্থিতি ঐ বিক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যকরী শক্তির চাহিদা কমিয়ে দেয়। ফলে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ অবস্থায় স্বল্প কার্যকরী শক্তি দিয়েই বিক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে। সে কারণে এনজাইমের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়। কিছু কিছু বস্তু এনজাইমের কাজে বাধা দেয়। এদেরকে **ইনহিবিটর** (inhibitor) বলে। এরা এনজাইমের সক্রিয় স্থানে সাবস্ট্রেট অপেক্ষা দ্রুত সংযুক্ত হওয়ায়, সাবস্ট্রেট এনজাইমের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না। ফলে সাবস্ট্রেটে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসে না। কীভাবে এনজাইম কাজ করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি মতবাদ প্রচলিত। নিচে মতবাদ দুটি আলোচনা করা হলো–

৩.১১.১. তালা-চাবি মতবাদ (Lock and Key Theory)

অধিকাংশ এনজাইম বৃহদায়তন প্রোটিন অণু যা কিছু ধাতব আয়নসহ শত শত অ্যামিনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি এনজাইম অণু সুনির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট (টারশিয়ারি গঠন)। এনজাইম অণুর গায়ে নির্দিষ্ট ধরনের খাঁজ বা পকেট থাকে। এরূপ খাঁজকে **সক্রিয় অঞ্চল** (active site) বলে। যেমন একটি তালার ফাঁকে নির্দিষ্ট চাবি আটকে যায়, তেমনি সক্রিয় অঞ্চলে হাইড্রোজেন বন্ধনী বা আয়নিক বন্ধনীতে এনজাইম অণুর সাথে সাবস্ট্রেট অণু সংযুক্ত হয়ে **এনজাইম-সাবস্ট্রেট** যৌগ (enzyme-substrate complex) গঠন করে। একবার এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ গঠিত হলে এনজাইম সাবস্ট্রেট অণুকে সহজেই ভেঙে দেয় বা অণুগুলোর

জেনে রাখো

লক অ্যান্ড কী মতবাদ টেমপ্লেট (template) মতবাদ নামেও পরিচিত। এক অণু এনজাইম এক মিনিটে যত সংখ্যক সাবস্ট্রেট অণুকে বিক্রিয়ালব্ধ বস্তুতে (product) পরিণত করতে পারে, সেই সংখ্যাকে টার্নওভার সংখ্যা বলে।

CamScanner

মধ্যে বন্ধনী সৃষ্টি করে বৃহৎ অণু গঠন করে। বিক্রিয়া শেষে উৎপাদিত পদার্থ বন্ধনীমুক্ত হয়ে দূরে সরে যায় এবং এনজাইম অবিকৃত অবস্থায় থাকে ও পুনরায় নতুন বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। জার্মান প্রাণরসায়নবিদ **ফিশার (Emil Fisher)** ১৮৯০ এর দশকে তালা-চাবি মতবাদ প্রদান করেন। তালা-চাবি মতবাদ অনুসারে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাবস্ট্রেট অণুটি বা অণুগুলোর আকৃতি অবশ্যই এনজাইমের সক্রিয় অঞ্চলে যুক্ত হওয়ার উপযোগী হতে হবে। এজন্যই এনজাইমের আকারে সামান্যতম পরিবর্তন হলে এর কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটে।

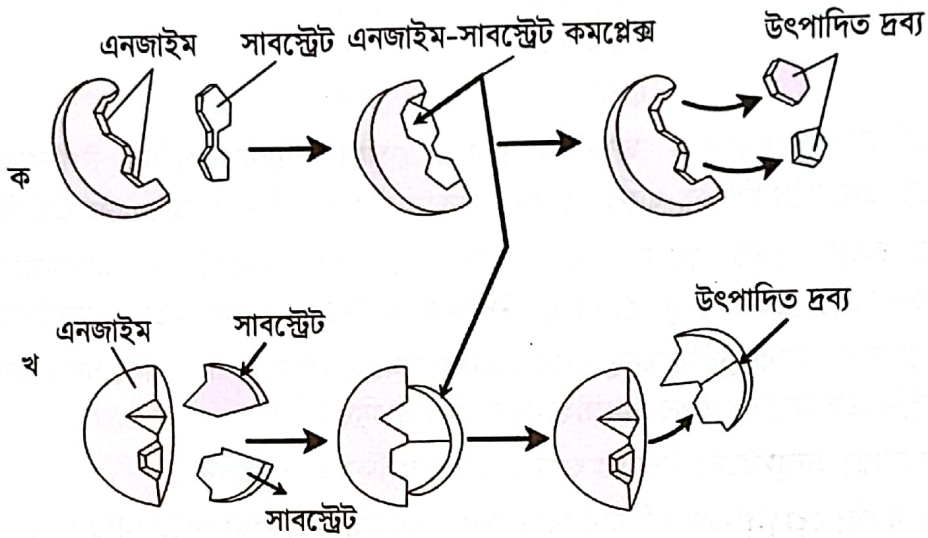

চিত্র-৩.২১: Emil Fisher কর্তৃক প্রবর্তিত তালা-চাবি মতবাদ, ক. ভাঙনমূলক বিক্রিয়া খ. গঠনমূলক বিক্রিয়া

কিছু কিছু এনজাইম একাধিক ধরনের সাবস্ট্রেটের উপর বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। যেমন— পেপিন এনজাইম ৬০—১৮০ ধরনের সাবস্ট্রেট অণুর উপর বিক্রিয়াশীল; সেজন্য তালা-চাবি মতবাদের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বিজ্ঞানীর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

৩.১১.২. আবেশিত উপযুক্ততা মতবাদ (Induced Fit Theory)

কোসল্যান্ড (D. Koshland) ১৯৬৬ সালে এনজাইমের কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে আবেশিত উপযুক্ততা মতবাদ উপস্থাপন করেন। তাঁর এ মডেলকে তালা-চাবি মডেলের সংশোধিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। এ মডেল অনুসারে এনজাইমের সক্রিয় অঞ্চলে সংযুক্তির জন্য সাবস্ট্রেটের নির্দিষ্ট গঠন বা সংযোগের প্রয়োজন নেই। বরং সাবস্ট্রেট অণুর আকার অনুসারে এনজাইমের সক্রিয় অঞ্চলের পরিবর্তন ঘটতে পারে। সাবস্ট্রেটের সাথে সংযুক্তির পরেই এনজাইমটি তার সর্বোচ্চ ক্যাটালাইটিক আকৃতি ধারণ করে। যেমন— একটি গ্লাভস হাতে পরার পর হাতের মতো আকৃতি পেয়ে থাকে। এ মডেলের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কার্বোক্সিপেপটিডেজ-A ও অন্যান্য কতিপয় এনজাইমের X-ray পর্যবেক্ষণ তিনি উপস্থাপন করেন।

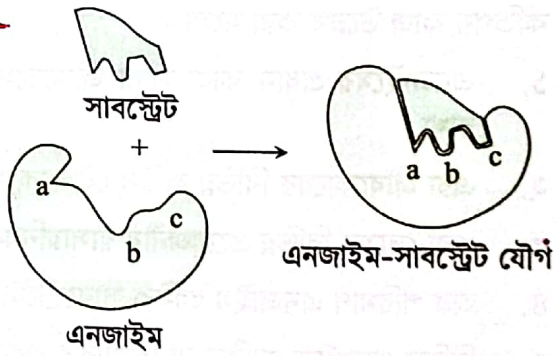

চিত্র-৩.২২: আবেশিত উপযুক্ততা মতবাদ

৩.১২ এনজাইমের কার্যকারিতার প্রভাবকসমূহ (Factors Affecting of Enzyme Actions)

১. **তাপমাত্রা:** এনজাইমের কার্যকারিতা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। 40°C এর উপরে এবং 0°C বা তার নিচের তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা দারুণভাবে কমে যায়। আবার এনজাইমের বিক্রিয়ার হার সবচেয়ে বেশি 35°C – 40°C তাপমাত্রায়। তাই এই তাপমাত্রাকে পরম তাপমাত্রা (optimum temperature) বলা হয়।

CamScanner

২. **pH:** অতিরিক্ত অম্ল বা অতিরিক্ত ক্ষারে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। এক একটি এনজাইমের এক একটি নির্দিষ্ট অপটিমাম pH থাকে। যেমন–

এনজাইম	অপটিমাম pH
পেপসিন	২.০
ইনভারটেজ	৪.৫
সেলুবায়েজ	৫.০
ইউরিয়েজ	৭.০
ট্রিপসিন	৮.০

৩. **পানি:** এনজাইমের কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখতে কোষে পরিমিত পানির উপস্থিতি আবশ্যক। পানির অনুপস্থিতিতে এনজাইম নিষ্ক্রিয় থাকে। যেমন– শুকনো বীজে পানি না থাকায় এনজাইম নিষ্ক্রিয় থাকে।

৪. **ধাতু:** কোনো কোনো ধাতুর (যেমন- Mg^{++}, Mn^{++}) উপস্থিতি এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আবার কোনো কোনো ধাতুর (যেমন-Ag, Zn, Cu) উপস্থিতি এনজাইমের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

৫. **সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্ব:** সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়লে এনজাইমের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং ঘনত্ব কমলে কর্মক্ষমতা কমে। অর্থাৎ সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্বের ওপর এনজাইমের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল।

৬. **এনজাইমের ঘনত্ব:** এনজাইমের ঘনত্বের ওপরও এদের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল।

৭. **প্রোডাক্ট-এর ঘনত্ব:** প্রোডাক্ট-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বিক্রিয়ার হার কমে যেতে পারে।

৮. **অ্যাকটিভেটর:** এনজাইমের বিক্রিয়ার হার অ্যাকটিভেটরের উপস্থিতিতে অনেকগুণ বেড়ে যায়।

৯. **প্রতিরোধক (ইনহিবিটর):** কিছু কিছু বাধা প্রদানকারী বস্তু বা ইনহিবিটরের উপস্থিতিতে এনজাইমের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়।

৩.১৩ এনজাইমের কাজ (Functions of Enzyme)

জীবদেহের সকল জৈবিক ক্রিয়ার মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম। জীবদেহকে সুস্থ-সবল রাখার ক্ষেত্রে সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে হয় এবং এ কাজগুলো মূলত এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিচে এনজাইমের কতিপয় কাজ উল্লেখ করা হলো–

১. এনজাইমের প্রধান কাজ হলো জীবদেহের সকল শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে জীবদেহকে কর্মক্ষম রাখা।

২. এরা জীবকোষের বিভিন্ন জটিল যৌগকে সরল যৌগে পরিণত করে।

৩. এরা দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষ করে।

৪. অল্প পরিমাণ এনজাইম অধিক সাবস্ট্রেটের উপর কাজ করে নতুন উৎপাদ সৃষ্টি করে।

৫. বিভিন্ন পদার্থকে জারিত বা বিজারিত করতে এনজাইম বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৬. এনজাইম জীবদেহে শক্তি উৎপাদন করে জীবের কর্মক্ষমতা বজায় রাখে।

৭. বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো বস্তু থেকে একটি কার্যকরী মূলককে অপর একটি বস্তুতে স্থানান্তরিত করতে এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮. এনজাইম কোন বস্তুর আইসোমার গঠনে কাজ করে।

৯. বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বন্ধন দ্বারা এনজাইম দুটি ভিন্ন ধরনের বস্তুকে সংযুক্ত করে।

১০. এনজাইম বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে।

১১. জীবদেহের গঠন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এনজাইম।

CamScanner

৩.১৪ জৈবিক কার্যক্রমে কতিপয় এনজাইমের ব্যবহার (Uses of Some Enzymes in Biological Activities)

১. **অ্যামাইলেজ (Amylase):** যে এনজাইম স্টার্চের প্রধান উপাদান অ্যামাইলোজের উপর কাজ করে তাকে অ্যামাইলেজ বলে। অ্যামাইলেজ দু'ধরনের। যথা– α-অ্যামাইলেজ ও β-অ্যামাইলেজ। α-অ্যামাইলেজ প্রথমে স্টার্চকে ভেঙ্গে ডেক্সট্রিনে পরিণত করে এবং β-অ্যামাইলেজ ডেক্সট্রিনের উপর কাজ করে তাকে মল্টোজে পরিণত করে।

অ্যামাইলেজের ব্যবহার:

i. বিভিন্ন ধরনের ডিটারজেন্টে অ্যামাইলেজ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে। এটি কাপড় ও থালাবাসন থেকে স্টার্চ অপসারণে ব্যবহৃত হয়।
ii. কিছু পানীয় উৎপাদন শিল্পে বিশেষ করে মদ ও বিয়ার উৎপাদন শিল্পে অ্যামাইলেজ ব্যবহার করা হয়।
iii. চিকিৎসাক্ষেত্রে, যেমন– প্যানক্রিয়েটিক এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে অ্যামাইলেজ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
iv. পাউরুটি শিল্পে জটিল স্টার্চকে ভেঙ্গে সরল চিনিতে পরিণত করতে অ্যামাইলেজ ব্যবহৃত হয়।

২. **প্রোটিয়েজ (Protease):** যে এনজাইম প্রোটিনের উপর ক্রিয়া করে প্রোটিনকে ভেঙ্গে সরল অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে তাকে **প্রোটিয়েজ** বলে। প্রোটিন থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি প্রক্রিয়াকে বলা হয় **প্রোটিওলাইসিস**। বীজের সঞ্চিত প্রোটিন অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ভেঙ্গে যায় এবং তা দ্রুত ভ্রূণে স্থানান্তরিত হয়। আমরা যে প্রোটিন গ্রহণ করি তাও এ এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে ভেঙ্গে যায় এবং আমাদের দেহ গঠনে অংশ নেয়। ট্রিপসিন, পেপসিন এবং প্যাপেইন প্রোটিয়েজভুক্ত কয়েকটি এনজাইম।

প্রোটিয়েজের ব্যবহার:

i. রক্ত জমাট বাঁধা নিয়ন্ত্রণে এ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
ii. ওষুধ তৈরিসহ বিভিন্ন শিল্পে এমনকি জীববিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় প্রোটিয়েজ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
iii. প্রোটিয়েজ এনজাইম বেকারি শিল্পেও ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহারে পাউরুটির গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৩. **সেলুলেজ (Cellulase):** যে এনজাইম সেলুলোজকে ভেঙ্গে সেলুবায়োজ তৈরিতে ভূমিকা রাখে তাকে **সেলুলেজ** বলে। উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক উপাদান হলো সেলুলোজ। তৃণভোজী প্রাণীর অন্ত্রে এক ধরনের অণুজীব বাস করে যারা সেলুলেজ তৈরি করে। ফলে ঘাস, খড়, পাতা ইত্যাদি সহজে হজম করতে পারে। মানুষের অন্ত্রে এ ধরনের অণুজীব না থাকায় মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না।

$$\text{সেলুলোজ} \xrightarrow{\text{সেলুলেজ}} \text{সেলুবায়োজ} \xrightarrow{\text{সেলুবায়েজ}} \text{গ্লুকোজ}$$

সেলুলেজের ব্যবহার:

i. বিভিন্ন ধরনের পানীয়, বিশেষ করে ফলের জুস তৈরিতে সেলুলেজ ব্যবহার করা হয়।
ii. বস্ত্রশিল্পে এবং পেপার ও পাল্প তৈরিতে সেলুলেজের ব্যবহার রয়েছে।
iii. ওষুধ তৈরিতেও এ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
iv. যেকোনো ধরনের ডিটারজেন্ট বা ওয়াশিং পাউডার তৈরিতে সেলুলেজ ব্যবহার করা হয়।
v. কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে সেলুলেজ এনজাইমের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

৪. **ক্যাটালেজ (Catalase):** যে এনজাইম হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে (H_2O_2) ভেঙ্গে পানি (H_2O) ও অক্সিজেনে (O_2) পরিণত করে তাকে **ক্যাটালেজ** বলে। অধিকাংশ জীবকোষে ক্যাটালেজ এনজাইমের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এক অণু ক্যাটালেজ এনজাইম প্রতি সেকেন্ডে H_2O_2 থেকে কয়েক লক্ষ পানি (H_2O) ও অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। pH মান 7-এ মানবদেহে ক্যাটালেজ এনজাইম সব থেকে ভালো কাজ করে।

ক্যাটালেজের ব্যবহার:

i. দুগ্ধ শিল্পে পনির তৈরির ক্ষেত্রে দুধ থেকে H_2O_2 অপসারণের কাজে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
ii. বস্ত্রশিল্পে কাপড় থেকে H_2O_2 দূরীকরণে এ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
iii. খাদ্যের জারণ ক্রিয়া রোধের জন্য খাদ্যের মোড়কে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
iv. ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহার করে চোখের কন্টাক্ট লেন্স (conact lens) পরিষ্কার করা হয়।

CamScanner

৫. **জাইমেজ (Zymase):** যে এনজাইম শর্করাকে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2-এ পরিণত করে তাকে **জাইমেজ** এনজাইম বলে। ইস্ট জাতীয় ছত্রাক কোষে এ ধরনের এনজাইম দেখতে পাওয়া যায়। এটি কিছুটা জটিল প্রকৃতির এনজাইম। জাইমেজ ক্রিয়ার উপযুক্ত তাপমাত্রা 25°C - 37°C।

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

জার্মান রসায়নবিদ **বুচনার** (Eduard Buchner) ১৮৯৭ সালে ইস্ট জাতীয় ছত্রাক থেকে জাইমেজ এনজাইম পৃথক করেন এবং এজন্য তিনি ১৯০৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জাইমেজ এনজাইমের ব্যবহার:

i. খাদ্য বদহজম নিরাময়ে জাইমেজ এনজাইম রোগীর ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
ii. বাণিজ্যিকভাবে অ্যালকোহল উৎপাদনে জাইমেজ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
iii. বেকারি শিল্পেও এ এনজাইমের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

৬. **লাইপেজ (Lipase):** যেসকল এনজাইম লিপিডকে আর্দ্রবিশ্লেষণের মাধ্যমে লাইপোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে তাকে লাইপেজ বলে। লাইপেজ এনজাইম অধিকাংশ প্রাণিদেহে লিপিড খাদ্যের পরিপাক, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রধান ভূমিকা রাখে।

লাইপেজের ব্যবহার:

i. দুগ্ধজাত শিল্পে পনির ও দই তৈরিতে লাইপেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
ii. বিভিন্ন ধরনের বেকারি খাদ্য তৈরিতে, ডিটারজেন্ট তৈরিতে এবং জৈব অনুঘটক হিসেবে লাইপেজ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।
iii. অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে রক্তের লাইপেজ পরীক্ষা করা হয়।

ব্যবহারিক জীবনে এনজাইমের প্রয়োগ বা গুরুত্ব (Application or Importance of Enzyme in Practical Life)

নিত্যদিনের ব্যবহারিক জীবনে এনজাইমের বহুবিধ প্রয়োগ রয়েছে। নিচে এনজাইমের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ তথা গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো–

১. **খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে:** বেকারি শিল্পে পাউরুটির গুণগত মান উন্নয়নে প্রেটিয়েজ এনজাইম, কর্ন সিরাপ তৈরিতে অ্যামাইলেজ এনজাইম এবং কফির বীজ থেকে কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে সেলুলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
২. **পনির তৈরিতে:** দুগ্ধ শিল্পে দুধ থেকে পনির তৈরিতে রেনিন নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
৩. **ফলের রস তৈরিতে:** বাণিজ্যিকভাবে ফলের রস তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে পেকটিন নামক এনজাইম ব্যবহারে ফলের রস পরিষ্কার ও সুস্বাদু হয়।
৪. **মদ শিল্পে:** মদ ও বিয়ার উৎপাদনে α-অ্যামাইলেজ এবং β-অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়। বিয়ারের ঘোলাটে অবস্থা দূর করতে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
৫. **কাপড়ের দাগ উঠাতে:** কাপড়ের ক্ষতি না করে কাপড়ের কঠিন দাগগুলো সহজে উঠাতে সেখানে অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
৬. **চিকিৎসাক্ষেত্রে:** চিকিৎসাক্ষেত্রে এনজাইমের বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে। যেমন– চোখের ছানি অপারেশনের সময় ট্রিপসিন ব্যবহার করা হয়। ইরিকেজ ও ইউরিয়েজ এনজাইমের সাহায্যে রক্তে ইউরিক অ্যাসিড ও ইউরিয়ার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে শর্করার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য গ্লুকোজ অক্সিডেজ ও পারঅক্সিডেজ ব্যবহার করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসকগণ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ব্যবহার করেন।
৭. **চামড়ার লোমমুক্তকরণে:** চামড়া শিল্পে কাঁচা চামড়া থেকে লোম অপসারণের জন্য সেখানে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
৮. **কাগজ শিল্পে:** কাগজের গুণগত মান বাড়াতে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম ব্যবহার করা হয়। যেমন– কাগজকে বর্ণহীন বা সাদা করতে যে ব্লিচিং ব্যবহার করা হয় সেই ব্লিচিং-এর পরিমাণ কমাতে জাইলেনেজ, কাগজের পানির পরিমাণ কমাতে সেলুলেজ এবং সবশেষে কাগজকে মসৃণ করতে লিগনিনেজ ব্যবহার করা হয়।

CamScanner

৯. **ডিটারজেন্ট তৈরিতে:** নিত্যদিনের ব্যবহারে যেসকল ডিটারজেন্ট রয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন রকমের এনজাইমের সংমিশ্রণ। যেমন– প্রোটিয়েজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, সেলুলেজ ইত্যাদি।

১০. **আইসক্রীম ও ক্যান্ডি তৈরিতে:** বিভিন্ন স্বাদের আইসক্রীম ও ক্যান্ডি তৈরিতে এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে। যেমন– আইসক্রীম তৈরিতে ল্যাকটেজ এনজাইম এবং ক্যান্ডি তৈরিতে ইনভার্টেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

১১. **রাবার শিল্পে:** ল্যাটেক্স থেকে রাবার তৈরির সময় H_2O_2 থেকে O_2 তৈরি করতে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১২. **পরিবেশ সংরক্ষণে:** পরিবেশে বিভিন্ন দূষক পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণে এনজাইম ব্যবহার করে বায়োসেন্সর তৈরি করা হয়।

১৩. **জীবপ্রযুক্তিতে:** জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার জিন প্রকৌশলে বিভিন্ন এনজাইম ব্যবহার করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা হয়। এখানে রেসট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে DNA-এর কাঙ্ক্ষিত অংশ কাটা হয়, লাইগেজ এনজাইমের সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে জোড়া লাগানো হয়। আবার পলিমারেজ এনজাইমের সাহায্যে DNA-র সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়।

১৪. **ফটোগ্রাফিক শিল্পে:** ফটোফিল্মের জেলাটিন পরিষ্কার করতে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১৫. **অভ্যন্তরীণ জমাট রক্ত গলাতে:** ধমনি এবং মস্তিষ্কের জমাট রক্ত গলাতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ বর্তমানে ইরোবাইলেজ নামক এনজাইম ব্যবহার করে থাকেন।

১৬. **শিশু খাদ্যে:** শিশু খাদ্যকে সহজ পাচ্য করতে ট্রিপসিন নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

১৭. **ক্ষত নিরাময়ে:** দেহের পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এক ধরনের এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৩.১৫ প্রোটিন ও এনজাইম গঠনগতভাবে অভিন্ন হলেও কার্যগতভাবে ভিন্ন (Proteins and Enzymes are Structurally Similar but Functionally Different)

প্রোটিন এবং এনজাইমের গঠনগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের উভয়েরই মূল গাঠনিক উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড। অর্থাৎ গঠনগতভাবে এরা অভিন্ন তবে কার্যগতভাবে এরা ভিন্ন। যেমন– প্রোটিন জীবদেহের গঠন ও বিকাশে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। DNA-তে সংরক্ষিত বংশগতির তথ্য প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রোটিন বংশগতিতে ভূমিকা রাখে। ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন কোষে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থেকে প্রয়োজনে জীবদেহে শক্তি যোগায়। অন্যদিকে, এনজাইম জৈব প্রভাবক হিসেবে কোষাভ্যন্তরে বিভিন্ন বিপাকীয় বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহ ইত্যাদি খাদ্য পরিপাকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের এনজাইম কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসায় এনজাইম ব্যবহার করা হয়। যেমন– উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বিশেষভাবে কাজ করে। এরকম ভিন্ন প্রকৃতির কাজ রয়েছে এনজাইমের। সুতরাং সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, প্রোটিন ও এনজাইম গঠনগতভাবে অভিন্ন হলেও কার্যগতভাবে ভিন্ন।

৩.১৬ রাসায়নিকভাবে সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয় (Chemically all Enzymes are Proteins but all Proteins are not Enzymes)

প্রোটিন এবং এনজাইম নিয়ে বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, রাসায়নিকভাবে সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়। যেমন– প্রোটিন ও এনজাইমকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে উভয় ক্ষেত্রেই অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এরা কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত। অনেক সময় এতে সালফার, আয়রন ও তামা থাকে। প্রোটিন ও এনজাইম উভয়েই জীবকোষে কলয়েডরূপে অবস্থান করে এবং এরা বর্ণহীন। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত প্রোটিন ও এনজাইমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে এনজাইমে এসকল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বেশ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা প্রোটিনে অনুপস্থিত। যেমন– এনজাইম খুব অল্পমাত্রায় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে। এরা তাপপ্রবণ, পানি ও লঘু অ্যালকোহলে এরা দ্রবণীয়। যেহেতু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রোটিনে অনুপস্থিত, তাই সকল প্রোটিন এনজাইম নয়। সুতরাং প্রোটিন ও এনজাইমের এ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, **সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়।**

CamScanner

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

শর্করা

শর্করাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সাধারণত বিভিন্ন অনুপাতে থাকে। গঠন অনুসারে শর্করাকে মনোস্যাকারাইড (এক অণু শর্করা দ্বারা গঠিত), অলিগোস্যাকারাইড (আর্দ্রবিশ্লেষণে দুই থেকে দশ অণু সরল শর্করা উৎপন্ন হয়) ও পলিস্যাকারাইডে (আর্দ্রবিশ্লেষণে অসংখ্য সরল শর্করা অণু তৈরি করে) বিভক্ত করা হয়।

বিজারক শর্করা

যেসব কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে বলা হয় বিজারক শর্করা। এদের প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। এরা অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে। যেমন– গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি বিজারক শর্করা।

গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী

একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে অপর একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সংযুক্তিকে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বলে। ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইডে একাধিক মনোস্যাকারাইড তাদের গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে। সুক্রোজ, সেলুলোজ, স্টার্চ প্রভৃতি যৌগসমূহে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বিদ্যমান।

স্টার্চ

স্টার্চ হলো উদ্ভিদজগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। এর রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। স্টার্চ উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্যরূপে জমা থাকে। প্রাকৃতিক স্টার্চ অ্যামাইলোজ ও অ্যামাইলোপেকটিনের সমন্বয়ে গঠিত।

সেলুলোজ

সেলুলোজ একটি জটিল হোমোপলিস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। স্বভোজী প্রতিটি উদ্ভিদকোষের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। জীবজ বিশ্বের প্রধান ও প্রাচুর্যময় উপাদান হলো সেলুলোজ।

প্রোটিন

অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড অণু পলিপেপটাইপ বন্ধনীতে আবদ্ধ অবস্থায় যে বৃহৎ অণু গঠন করে তাই প্রোটিন হিসেবে পরিচিত। প্রোটিনে সর্বাধিক ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এবং এর সাথে অন্য জৈব বা অজৈব অণু যুক্ত থাকতে পারে।

পেপটাইড বন্ধনী

পলিপেপটাইড শিকলে বিদ্যমান পাশাপাশি দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি কার্বোক্সিল গ্রুপের (–COOH) সাথে অপরটির α অ্যামিনো ($–NH_2$) গ্রুপের মধ্যে গঠিত বন্ধনীকে পেপটাইড বন্ধনী বলে। অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বৃহৎ প্রোটিন অণু গঠন করে।

লিপিড

যেসব জৈব পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু অন্যান্য জৈব দ্রবণ যেমন– ইথানল, ইথার, ক্লোরোমিথেন প্রভৃতিতে দ্রবণীয় তাদেরকে লিপিড বলে। লিপিড আর্দ্রবিশ্লেষণের মাধ্যমে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে। রাসায়নিক গঠন অনুসারে লিপিড তিন প্রকার। যথা: সরল, যৌগিক ও লিপিড জাতক। আণবিক গঠন অনুসারে লিপিড পাঁচ প্রকার।

এনজাইম

যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করে ও বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে এনজাইম বলে। শুধু প্রোটিন দ্বারা গঠিত এনজাইমকে সরল এনজাইম ও প্রোটিনের সাথে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকলে তাকে সংযুক্ত এনজাইম বলে। বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমকে ৯ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

ক্যাটালেজ

ক্যাটালেজ এনজাইম হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে (H_2O_2) ভেঙে পানি (H_2O) ও O_2 এ পরিণত করে। এক অণু ক্যাটালেজ এনজাইম অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ H_2O_2 অণুকে বিজারিত করতে পারে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$

CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পার্থক্যসমূহ

▶ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের মধ্যে পার্থক্য

গ্লুকোজ	ফ্রুক্টোজ
i. গ্লুকোজ অ্যালডোহেক্সোজ শ্যুগার, কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) বিদ্যমান।	i. ফ্রুক্টোজ কিটোহেক্সোজ শ্যুগার, কারণ এতে কিটো গ্রুপ (>C = O) বিদ্যমান।
ii. একে গ্রেইপ শ্যুগার বলা হয়।	ii. একে ফ্রুট শ্যুগার বলা হয়।
iii. গ্লুকোজ শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ।	iii. শ্বসনে গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
iv. এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোজ ধরনের।	iv. এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোজ ধরনের।
v. এটি ডানাবর্ত শর্করা।	v. এটি বামাবর্ত শর্করা।

▶ মনোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইডের মধ্যে পার্থক্য

মনোস্যাকারাইড	পলিস্যাকারাইড
i. একটি মাত্র শর্করা অণু দিয়ে গঠিত।	i. অনেকগুলো মনোস্যাকারাইডের একক নিয়ে গঠিত।
ii. আর্দ্রবিশ্লেষণে এদেরকে আর কোনো ক্ষুদ্র এককে ভাঙা যায় না।	ii. আর্দ্রবিশ্লেষণে এদেরকে অসংখ্য মনোস্যাকারাইড এককে ভাঙা যায়।
iii. এরা স্বাদে মিষ্ট, দানাদার ও পানিতে দ্রবণীয়।	iii. এরা স্বাদে মিষ্ট নয়, অদানাদার ও পানিতে অদ্রবণীয়।
iv. এরা সরল কার্বোহাইড্রেট।	iv. এরা জটিল গঠন বিশিষ্ট কার্বোহাইড্রেট।
v. শোষণের পূর্বে পরিপাকের প্রয়োজন হয় না।	v. শোষণের পূর্বে পরিপাকের প্রয়োজন হয়।

▶ স্টার্চ ও সেলুলোজের মধ্যে পার্থক্য

স্টার্চ	সেলুলোজ
i. স্টার্চ অণুতে প্রায় ১২০০ থেকে ৬০০০ গ্লুকোজ একক α -গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	i. সেলুলোজে প্রায় ৩০০ থেকে ৩০০০ গ্লুকোজ একক β - গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
ii. স্টার্চ হলো α-D গ্লুকোজের পলিমার।	ii. সেলুলোজ হলো β-D গ্লুকোজের পলিমার।
iii. স্টার্চ অণু শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।	iii. সেলুলোজ অণু অশাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।
iv. উদ্ভিদদেহে এটি সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।	iv. উদ্ভিদদেহে এটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে থাকে।
v. আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে নীল বর্ণ প্রদান করে।	v. আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে কোন বর্ণ প্রদান করে না।
vi. গরু-ছাগল ও মানুষ স্টার্চ পরিপাক করতে পারে।	vi. মানুষ সেলুলোজ পরিপাক করতে পারে না।

▶ রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজের মধ্যে পার্থক্য

রাইবোজ	ডিঅক্সিরাইবোজ
i. আণবিক গঠনে ৫টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	i. আণবিক গঠনে ৪টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
ii. এটি RNA এর অপরিহার্য উপাদান।	ii. এটি DNA এর অপরিহার্য উপাদান।
iii. রাইবোনিউক্লিওটাইড ও শর্করা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।	iii. ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড গঠনে অংশগ্রহণ করে।
iv. এর গলনাঙ্ক 95°C।	iv. এর গলনাঙ্ক 91°C।

CamScanner

রাইবোজ	ডিঅক্সিরাইবোজ
v. গাঢ় HCl অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড তৈরি করে।	v. গাঢ় HCl অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লেভুলিনিক অ্যাসিড তৈরি করে।
vi. ২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে।	vi. ২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে না।
vii. এর আণবিক সংকেত: $C_5H_{10}O_5$	vii. এর আণবিক সংকেত: $C_5H_{10}O_4$

▶ লিপিড ও প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য

লিপিড	প্রোটিন
i. লিপিড সাধারণত কক্ষ তাপমাত্রায় তরল এবং কিছু লিপিড কঠিন অবস্থায় থাকে।	i. প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত।
ii. এরা পানিতে অদ্রবণীয়।	ii. এরা প্রধানত পানিতে, লঘু অ্যাসিডে, ক্ষার ও মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয়।
iii. এর প্রধানত ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে কাজ করে।	iii. প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী এবং বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।
iv. লিপিডসমূহ স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন।	iv. এরা স্বাদহীন।
v. এরা আলোক সমাণু গঠন করে না।	v. এরা আলোক সমাণু গঠন করে।
vi. লিপিড জীবের প্রধান গাঠনিক একক নয়।	vi. প্রোটিন জীবের প্রধান গাঠনিক একক।

▶ এনজাইম ও কো-এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	কো-এনজাইম
i. এনজাইম একটি বড় প্রোটিন অণু অর্থাৎ এনজাইম প্রোটিনধর্মী।	i. কো-এনজাইম প্রোটিন অণুর একটি অপ্রোটিন অংশ।
ii. এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।	ii. কো-এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ প্রোটিন অংশ ব্যতীত কাজ করতে পারে না।
iii. এনজাইমের আণবিক ওজন ১২,০০০-১,০০,০০০ ডাল্টন।	iii. কো-এনজাইমের আণবিক ওজন অনেক কম (৫০০ ডাল্টনের কাছাকাছি)।
iv. কোনো ভিটামিন এনজাইম হিসেবে কাজ করে না।	iv. অনেক ভিটামিন কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে।
v. তাপের প্রভাবে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয় (50-60°C তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা থাকে না)।	v. কো-এনজাইমের তাপমাত্রা সহন ক্ষমতা অনেক বেশি।

▶ চর্বি ও তেলের মধ্যে পার্থক্য

চর্বি	তেল
i. চর্বি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি।	i. তেল অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি।
ii. চর্বির ফ্যাটি অ্যাসিড শিকলটি বেশ লম্বা।	ii. তেলের ফ্যাটি অ্যাসিড শিকলটি খাটো।
iii. সাধারণত কক্ষ তাপমাত্রায় (২০°সে.) চর্বি কঠিন বা অর্ধ-কঠিন অবস্থায় থাকে।	iii. কক্ষ তাপমাত্রায় (২০°সে.) তেল তরল থাকে।
iv. চর্বির গলনাঙ্ক অনেক বেশি (প্রায় ৭০°সে. এর কাছাকাছি)।	iv. তেলের গলনাঙ্ক অনেক কম (মাত্র ৫°সে. এর কাছাকাছি)।
v. উদাহরণ: ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি, উদ্ভিজ্জ চর্বি, পাম অয়েল, নারিকেল তেল ইত্যাদি।	v. উদাহরণ: ভোজ্য তেল।

CamScanner